KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/১, [illegible] লেন, [illegible]
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 26/4 27/1 27/3	Year of Publication : Oct - Dec 2005 Jan - March 2006 July - Sept 2006
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ বসন্তকালীন সংখ্যা
১৪১২

নন্দন

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক ॥ রাহুল সেন

Collections of short stories in English / English translation

Contemporary Indian Short Stories *(Series I-IV) per set*	180.00
Contemporary Indian Short Stories In English *Compiled by Shiv K. Kumar*	75.00
Anthology of Hindi Short Stories *Compiled by Bhisham Sahni*	150.00
Selected Kannada Short Stories *Edited by G. S. Amur*	75.00
The Drought and Other Stories (Reprinted 2004) *by Saratchandra Chattopadhyay*	50.00
Anandibai and Other Stories *by Parashuram*	50.00
Krishan Chander : Selected Short Stories *Compiled by Gopi Chand Narang*	80.00
Rajinder Singh Bedi : Selected Short Stories *Compiled by Gopi Chand Narang*	80.00
The Prayer Room and Other Stories *by Kishori Charan Das*	80.00
The Night of the Full Moon *by Kartar singh Duggal*	75.00
The Bird of Gold and Other Stories *by Ch. OM Goswami*	30.00
Indian Short Stories (1900-2000) *Ed. by E. V. Ramakrishnan*	(PB) 200.00 (HB) 250.00
Short Stories from Pakisthan *Ed. by Intzar Hussain and Asif Farrukhi*	150.00
Modern Bodo Short Stories *Selected and translatad by Joykanta Sharma*	50.00
Contemporary Kashmiri Short Stories *by Neerja Mattoo*	
Father Samuel and Others Stories *by Chandrasekhor Rath* *Tr. by Asok K. Mohanty*	80.00

SAHITYA AKADEMI

Head Office
Rabinrda Bhavan
35 Ferozeshah Road,
New Delhi 110 001

Regional Office
Jeevan Tara
23A/44X, D.H. Road
Kolkata - 700 053

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বসন্ত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ বসন্তকালীন সংখ্যা

১৪১২

সূচি

সম্পাদকীয়

অগ্রন্থিত রচনা : শিবরাম চক্রবর্তী

বাঙালির বেকারদশা ও ঘি-এর ব্যবসা (বিশেষ রচনা) ৩

নিবারণের নিমন্ত্রণ রক্ষা (গল্প) ১০

ফিরে দেখা : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

পাখি-ওড়া ছায়া (গল্প) ১৭

পুষ্প প্রদর্শনী (কবিতা) ২১

ঈশ্বর ও জ্যোৎস্না (কবিতা) ২২

শিল্পভাবনা

নির্বাক কবিতা, সবাক ছবি : মনসিজ মজুমদার ২৫

ভাষায় চিত্রকল্প, চিত্র-অনুষঙ্গ : হিরণ মিত্র ৩৮

বিশেষ ক্রোড়পত্র : নিউ থিয়েটার্স-এর ৭৫ বছর পূর্তি

মুক্তি (সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য) ১

উদয়ের পথে (সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য) ৪১

বিভাব

১. দয়া করে কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা কোনোভাবেই ফেরত দেওয়া হয় না।
২. লেখা প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। শুধুমাত্র ডাকে লেখা পাঠান। মনোনীত হলে আমরাই খবর দেবো।
৩. পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠান। পাতার একদিকে লিখুন।
৪. প্রবন্ধে কোনো উদ্ধৃতি দিলে দয়া করে যে গ্রন্থ বা স্থান থেকে নেওয়া হল, তার প্রতিলিপি পাঠান। বিভাব (লেখা নির্বাচিত হলে) প্রতিলিপির খরচ বহন করবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা স্মৃতিকে বিশ্বাস করি না। অবশ্যই কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে এই নিয়ম প্রযোজ্য।
৪. বিভাবে ব্যবহৃত বানান সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অতীতের উজ্জ্বল উদ্ধার বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) এর ব্যতিক্রম হবে।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

RN 30017/76

Declaration U/S of the Press & Registration of Book Act.

১। **প্রকাশের স্থান** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
২। **প্রকাশের কালানুক্রম** : ত্রৈমাসিক
৩। **প্রধান সম্পাদকের নাম** : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদকের নাম : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। **ঠিকানা** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
৪। **মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম** : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। **ঠিকানা** : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
৫। **স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা** :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও রাহুল সেন। ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

আমি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বা) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

তিরিশ বছর। যে-কোনো পরিসরেই এক দীর্ঘ সময়। এতদিন আগে যে যাত্রার শুরু, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, চড়াই-উতরাই, সাময়িক বিরতি পেরিয়ে তা আজো টিকে রয়েছে। বলা ভালো টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রণব্যয়, কাগজের দামের ক্রম-উর্ধগতির সঙ্গে লড়াই এখনো আমাদের পর্যুদস্ত করেনি। কিন্তু আমরা কিছুটা ক্লান্ত। বরং রাজনৈতিকভাবে বলা যাক, 'এ লড়াই চলছে, চলবে'।

ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। কিন্তু আমরা আনন্দিত নই। চলে গেছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। বসন্তে তাই এবার শুধুই রিক্ততা। চিরাচরিতভাবে শোকপ্রকাশ করলে হয়তো থামিয়ে দিয়ে বলতেন 'ক্লিশে'। তাই সেই চেষ্টায় অলমিতি। একবার চিরাচরিত তির্যকভাবে বলেছিলেন (কোনো সাক্ষী নেই) বাংলা সাহিত্যে আমার অবদান বোধহয় 'তো' আর 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করা। চলে যাওয়ার পর এবার হয়তো আমরা বুঝব ছায়া কীভাবে দীর্ঘতর হয়। 'ফিরে দেখা' অংশে পুনঃপ্রকাশিত হল, বিভাব-এ অনতি-অতীতে মুদ্রিত তাঁর একটি গল্প ও দুটি কবিতা।

এ-ছাড়াও এবারের অন্যতম আকর্ষণ শিবরাম চক্রবর্তীর দুটি কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। অগ্রন্থিত রচনাদুটি (শেষেরটি গল্প) পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ-ছাড়াও রয়েছে শিল্পভাবনা বিষয়ক দুটি বক্তৃতার পরিমার্জিত পাঠ। সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের মধ্যে যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, তা আবার নতুন করে আমাদের কাছে আবিষ্কৃত হবে।

নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হল। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক বীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩১ সালে যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন তা কালক্রমে বাংলা-সংস্কৃতিজগতের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে রয়ে গেছে শুধুই স্মৃতি। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত দুটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, 'মুক্তি' ও 'উদয়ের পথে'। প্রবীণ অথচ যাঁরা আজো আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন সমকালে এই দুটি 'বায়োস্কোপ' কী বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। চলচ্চিত্রের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত বিভাব-এর বিশেষ সংখ্যায় এই দুটি চিত্রনাট্য ছাপা হয়েছিল। এবারে ছাপা হল পরিমার্জিত সংস্করণ। আশা রাখি চিত্রনাট্য দুটি পাঠকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে।

বিনীত নমস্কারান্তে

রাহুল সেন

সম্পাদক : বিভাব

সম্পাদকমণ্ডলী
কলকাতা
পবিত্র সরকার ❖ প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায় ❖ অনাথনাথ দাশ ❖ স্বপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা ৬৮।
দূরভাষ : ২৪৭৩ ৩৬০০
চলমান : ৯৮৩১৩ ০৯৪০৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

রূপারোপ : অভিজিৎ নাথ

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
দে বুক স্টোর্স

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৬৮ থেকে প্রকাশিত,
'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত ও
'বর্ণনা প্রকাশনী', ৪/১০এ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে মুদ্রিত।

অগ্রন্থিত রচনা

বিশেষ রচনা
গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী

বাঙালির বেকারদশা ও ঘি-এর ব্যবসা

পুনর্মুদ্রণ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

এই দেশেই চার্বাকের অনুশাসন ছিল—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কিন্তু কর্মহীনতার দুর্দশা থেকে বাঙালির জীবনে যে অনর্থের দশা আজ এসেছে তাতে কোনো ধারেই ধার পাবার ভরসা নেই! এমনকী, ঘৃত পানের জন্যও না, শ্রীঘৃতের জন্য তো নয়ই, সস্তা ভেজিটেবল ঘিয়ের জন্যও না! কিন্তু পানের জন্য নয়, যদি ঘি-এর ব্যবসা করা হয়, এমনকী ঋণ করেও, তাহলে ঘৃত-যোগে বহু বেকারের বিকর্মদশার দুর্যোগ দূর হতে পারে; সংক্ষেপে সেই পথের ইঙ্গিত দেবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

চাকরি না-জোটার যত ভ্যাজাল, তেমনি বেড়েছে ঘিয়ের ভেজাল; অন্ন-সমস্যা ও ঘি-সমস্যা দুয়েরই সমাধান হতে পারে—এক ঢিলে দুই পাখিই মরে যদি বাংলার ধনবল ও জনবল আজ ঘি-এর ব্যাপারে লাগে। অবশ্য ঘিয়ের কাজেই যে সমস্ত বেকারের মুক্তি হবে এমন কথা বলি না, তবু এই পথে যে অনেকেরই কর্মসুযোগ আছে একথা জোর করেই বলা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুদিন থেকে বলছেন যে বাঙালিকে বাঁচতে হলে চাকরির মোহ ছেড়ে ব্যবসার বাজারে ভিড়তে হবে। বহু ব্যবসার মধ্যে ঘি-ও একটা ব্যবসা, কিন্তু একমাত্র ব্যবসা নয় একথা মনে রাখা দরকার। ক্লাইভ স্ট্রিটের মায়া-মরীচিকার পেছনে ছোটা ছাড়তে হবে তা সত্য, কিন্তু কটন স্ট্রিটেই যে সবার মোক্ষ রয়েছে একথা আমি বলছিনে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য এই যে সমস্ত বড়োবাজার জুড়েই বাঙালির ভবিষ্যৎ—এই বড়োবাজারের অধিকার বাঙালি হারিয়েছে, এই অধিকার তাকে আবার ফিরে পেতে হবে। কিন্তু এই কথাও সেই সঙ্গে মনে রাখা চাই যে এই বড়োবাজার কেবলমাত্র কলকাতার এক বিশেষ অংশে বদ্ধ হয়ে নেই—সমস্ত বাংলার বুকে, বাংলার বাইরে, সারা দুনিয়া জুড়ে এই বড়োবাজার। এই বড়োবাজারে যখন বাংলার টাকা আর বাঙালির ছেলে খাটবে তখনই এই দেশের অদৃষ্টে সম্পদের শুভলগ্নে সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হবেন।

ঘিয়ের বাজারের কথাই বলি। কলকাতায় এখন এই ব্যবসায় কমবেশি এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকার ঘি বিক্রি হয়, অন্ততপক্ষে বছরে বহু লাখ টাকা লাভ দাঁড়ায়। কিন্তু এই লাভের প্রায় সমস্তটাই যায় অন্যপ্রদেশীয় পকেটে; কেননা এই এক কোটি পঁচিশ লাখের মধ্যে এক কোটি পনেরো লাখই হচ্ছে অবাঙালির মূলধন। শ্রীঘৃতের অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রমুখ যে ক-জন বাঙালি ব্যবসায়ীর টাকা ঘিয়ের ব্যাপারে খাটে তা সমস্ত জড়িয়েও দশ লাখের বেশি হবে না—তারো কিছু আবার মাড়োয়ারির কাছে ধার-করা। বাংলাদেশে ঘিয়ের খদ্দের প্রধানত বাঙালিই, তবু যে কেন লাখ লাখ টাকা বাংলার বাইরে চলে যায় সে এক সমস্যা। তার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালির টাকার গায়ে এমন কিছু আছে যার জন্য অন্য দেশে পিছলে গিয়ে পড়াই তার স্বভাব—ঘি-মাখানো হলে তো আর কথাই নেই!

অথচ বছর চল্লিশ আগে এমন ছিল না; সেকালে ঘিয়ের ব্যবসা বাঙালিরই একচেটে ছিল। সে সময়ে পঁচিশ জন মহাজনের কারবারে গড়ে চল্লিশ হাজার করে দশ লক্ষ টাকা

খাটত এবং তাঁদের ব্যবসার সমস্ত বিভাগে বাঙালি ছিল। অথচ তখনকার চেয়ে ঘিয়ের কাটতি এখন পাঁচগুণ বেশি, তখন ঘি পঁচিশ টাকা মন বিকোত, এখন সেখানে তার দর ষাট টাকা, কখনো কখনো পঁচাত্তর পর্যন্ত ওঠে। অর্থনীতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি-নিয়মে এই এক কোটি পঁচিশ লাখের সমস্তটাই এখন বাঙালির মূলধন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চল্লিশ বছর আগে তখনো যে দশ লাখ এখনো সেই দশ লাখ! বোধ করি, একেই বলে ভদ্রলোকের এক কথা!

মনে করলে এই এক কোটি পঁচিশ লাখের গোটা কারবারটাই বাঙালির অধিকারে আনা অসম্ভব নয়। কেননা ঘি আমরাই কিনি, আমরা যদি সংকল্প করি যে অবাঙালির ঘি কিনব না তাহলে বছর বছর ত্রিশ লাখ টাকা আর বাংলার বাইরে যায় না এবং এই সুযোগে অন্তত দশ হাজার যুবকের কর্মযোগ ঘটে,—আমাদের ঘিয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের ভাতের ব্যবস্থা হয়। বাঙালির স্বদেশিবোধ আরেকটু কম ব্যাপক এবং কম সূক্ষ্ম হলেই এটা সম্ভব হতে পারে। আমাদের ভাই আমাদের আত্মীয় আমাদেরই বাংলার বেকার যুবক হা অন্ন হা অন্ন করে ফিরছে অথচ আমরা মাড়োয়ারির ঘি খাই এবং বোম্বাই মিলের কাপড় পরি। বাংলাদেশে দশটা বঙ্গলক্ষ্মীর মতো কাপড়ের কল এবং পঞ্চাশটা শ্রীঘৃতের মতো কারবার চলতে পারে—অসংখ্য বিকর্মার কর্মসংস্থান হয় এবং অনুরূপ আরো বহু বাঙালির ব্যবসা প্রেরণা এবং প্রতিষ্ঠা পায় যদি এই শুভবুদ্ধি আমাদের মাথায় আসে যে বাংলাদেশের থাকতে অন্য দেশের কিছু কেনার মানেই অর্থনৈতিক আত্মহত্যা করা।

আমাদের দেশাত্মবোধের মধ্যে কিছু পরিমাণে ধোঁয়া আছে। দেশ বলতে আমরা বুঝি ভৌগোলিক দেশকে, দেশের মানুষকে না। এবং দেশের কাজ বলতে বুঝি তিনরঙা জাতীয় পতাকা ঘাড়ে নিয়ে তারস্বরে জয়ধ্বনি করা। দেশের প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধোঁয়াটে ধারণা। বস্তুতপক্ষে দেশের প্রতি কর্তব্য হচ্ছে দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য এবং মাত্র মৌখিক সহানুভূতিতে, মিটিং-এর কাপড়ে ও মিটিং-এর কান্নায় সেই কর্তব্য চুকিয়ে দেওয়া চলে না। দেশের নিরন্নতা, দেশবাসীর দুর্গতি, দেশের যুবকদের বেকার অবস্থার বিমোচন সেই কর্তব্যের মধ্যে। যা আমাদের সাধ্যের বাইরে নয় সেই স্বদেশি জিনিস কিনে এই কর্তব্যের অনেকটা আমরা পালন করতে পারি। যখনই আমরা স্বদেশি জিনিস কিনি তখনই আমরা যথার্থভাবে স্বদেশের কাজ করি—কেননা তার দ্বারা দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব-পালন হয়। বিদেশি জিনিস কিনে যে কেবল দেশের দেনা বাড়াই তাই নয়, নিজের ভ্রাতৃঋণের বোঝাও ভারী করি।

কিন্তু স্বদেশি কিনব এই সংকল্পই যথেষ্ট না, কি স্বদেশি এবং কি স্বদেশি নয় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ থাকা দরকার। অসহযোগের যুগে স্বদেশি-খদ্দেরের উৎসাহের কাছে জাপানি খদ্দরেরও বাদ-বিচার ছিল না—কিন্তু সেই খদ্দরের চেয়ে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধুতি যে বেশি স্বদেশি ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজ কেবল জাপানি খদ্দরই নয়, গুজরাটি খদ্দরও আমাদের কাছে বিদেশি গণ্য হওয়া উচিত—বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতির কাছে। গুজরাট ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ অতএব গুজরাট আমাদের স্বদেশের অন্তর্গত একথা কেবল ভৌগোলিক সত্য, নাড়ির টানের সত্য নয়। কেননা তেমনি সত্য যে জাপান এশিয়ার মধ্যে

এবং এশিয়া আমাদেরই প্রাচ্য দেশ,—প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবীই আমাদের প্রদেশ; কিন্তু এই বিশ্বপ্রেমের বৃহৎ বোধকে অন্তরের মধ্যে লালন করা ভালো, নিত্যকর্মে পালন করতে গেলেই দুর্বিপাক। কেননা এই বৃহৎ বোধের কৃপায় বেকার-সমস্যা দূর হবে না বরং ক্রমশই বেড়ে যাবে; এই ভাববিলাসের দ্বারা নিরন্নের অন্নসংস্থানের আশা নেই, উলটে এই উচ্চচিন্তার ফলে আমাদের অন্নচিন্তা দিন দিন আরো চমৎকার হয়ে উঠবে।

স্বদেশির মন্ত্র বাংলাদেশেরই—কিন্তু আজ নূতন অর্থে তাকে গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্র চিরদিনই এক থাকে, কিন্তু যুগে যুগে তার ইঙ্গিত বদলায়। বাঙালির কাছে আজ এই মন্ত্রের নূতন মর্ম উদ্ঘাটন করা দরকার। আজ বাঙালিকে বুঝতে হবে গুজরাট ভারতবর্ষের মধ্যে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে নয়—এইজন্যই আহমেদাবাদের ধুতি বাঙালির কাছে বিদেশি। বাঙালিকে বাঁচতে হলে তার কাছে আজ Buy Indian এর চেয়েও বড়ো কথা Buy Bengalee। স্বয়ং-আমি সোহং, বিশ্বাত্মা, ব্রহ্ম, বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক যা খুশি হতে পারি কিন্তু প্রথমে আমি আমার মা-র সন্তান, আমার প্রথম কর্তব্য আমার ভায়েদের প্রতি; এইজন্যই আজ এই বোধ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে আমরা প্রথমে বাঙালি তারপরে ভারতবাসী বা অন্য কিছু।

অতঃপর, ঘিয়ের কথাতেই আবার ফেরা যাক,—পঞ্চাশ বছর আগের বৃত্তান্তই বলি। বাংলাদেশের চাহিদা তখন বাংলাদেশের ঘিয়েই মিটত, তখনো পশ্চিমি ঘি-এর মুলুকে রেল লাইন পড়েনি এবং অবাঙালি ঘিয়ের আমদানি আরম্ভ হয়নি। সেই সময়ে ঘাটাল চন্দ্রকোণা বালিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে মটকিতে ঘি আসত। তখনো টিনের প্রচলন হয়নি; খুব সম্ভব শ্রীঘৃত থেকেই টিনের চলন শুরু হয়। গোড়াগুড়ি কেরোসিন তেলের টিনেই ঘি ভরা হত, কিন্তু খুব ভালো করে ধুলেও কেরোসিনের গন্ধ একেবারে যায় না এবং তাতে ঘিয়ের ক্ষতি হয় বলে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ই প্রথম অর্ডার দিয়ে শ্রীঘিয়ের জন্য আলাদা টিন তৈরি করান—সাধারণের সুবিধার জন্য আড়াই সের পর্যন্ত টিনের প্রবর্তন তাঁর থেকেই।

আশি বছর আগে ঘির দর ছিল এই :

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে (মন প্রতি)

জ্বালানি ঘৃত	...	...	১৫টাকা
গাওয়া	...	...	১৯ টাকা ৮ আনা (৩২ পয়সা)
মুঙ্গের	...	...	১৭ টাকা ১২ আনা (৪৮ পয়সা)
ভয়সা	...	...	১৬ টাকা ১২ আনা (৪৮ পয়সা)
চৌপল	(মসলিপট্টন)	...	১৭ টাকা ৪ আনা (১৬ পয়সা)
নাথপুর	(মুর্শিদাবাদ)	...	১৭ টাকা ১২ আনা (৪৮ পয়সা)

আকবরের সময়ে (১৫৫৬—১৬০৫) ঘিয়ের দাম :

দিল্লির দর	(মন প্রতি)	...	২ টাকা ১০ আনা (৪০ পয়সা)
দুধ	(মন প্রতি)	...	১০ আনা (৪০ পয়সা)

চল্লিশ বছর আগে ঘিয়ের দর ছিল মনকড়া (*প্রতি মন) ২৫ টাকা।

১৯১৮ সালে যুদ্ধের পরে শ্রীঘৃতের দর ১০০ টাকা মন।

১৯৩৩ সালে এখন ঘিয়ের বাজার :

শ্রীমার্কা	...	৫৪ টাকা
খুরজা	...	৪৬ টাকা
শেকোহাবাদ	...	৪৪ টাকা
সাগর	...	৩৫ টাকা

চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশের ঘিয়েই বাঙালির অভাব মিটত—বাংলার বাইরের ঘি বলতে একমাত্র মসলিপট্টমের ঘিয়েরই তখন কেবল আমদানি ছিল। এই ঘি চামড়ার কুপোয় সমুদ্রপথে আসত, আনা খুব ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর ছিল বলে এর আমদানি পরে বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমদিকে প্রথম দানাপুর পর্যন্ত রেল হতেই সেখানকার ঘি বাংলার বাজারে আসতে শুরু করে—ঘিয়ের দানাদার বিখ্যাতি দানাপুর থেকেই হয়েছে কিনা সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়! তারপর মোগলসরাই পর্যন্ত রেল খুলতেই আড়া, বালিয়া, বক্সার প্রভৃতি জায়গার ঘি কলকাতায় আসতে শুরু হল। এদিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হতেই বেজওয়াদা, টেনালি, গন্টুরের ঘি এখানকার বাজারে এসে পড়ল। ক্রমশ আরো পশ্চিমে রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমি ঘি বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলল।

এখন এইসব কেন্দ্র থেকে কলকাতার বাজারে ঘিয়ের আমদানি হয়ে থাকে : খুরজা, বুলন্দসর, হাতরাস, আলিগড়, কাসগঞ্জ, আগ্রা, মথুরা, দ্বারকা, টেনালি, গন্টুর, বেজওয়াদা, রাজপুতানা, বুন্দেলখন্ড, গোয়ালিয়র, ছোটনাগপুর, পালামৌ, ডালটনগঞ্জ, শিবগুহা, নেপাল-তরাই, গোরক্ষপুর, পূর্ণিয়া, ব্রিজমনগঞ্জ, নেপালগঞ্জ, নানপাড়া, মুঙ্গের, আরা, বালিয়া, বিষমপুর, রোহতক, সফেদামন্ডি, নারনোল ইত্যাদি। এই তালিকা থেকেই দেখা যাবে বাংলার বাজারে এখন বাংলার ঘিয়ের স্থান কোথায়। পূর্বে মেদিনীপুরের ঘাটাল, চন্দ্রকোণা এবং পূর্ববঙ্গের পাবনা বিক্রমপুর থেকে মটকির ঘি আসত, কিন্তু পশ্চিম মুলুক থেকে টিনভরতি ঘিয়ের আমদানি হতেই, পশ্চিমি টিনের প্রথম ঠোক্করেই বাংলার মটকি ফেঁসে গিয়ে মটকায় উঠল! টিনের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কার প্রচলন হয়—পাতিরাম মার্কা, শ্রীমার্কা ইত্যাদি মার্কামারা ঘিয়ের চলতি শুরু হয় সেই সময় থেকেই। পশ্চিমি ঘিয়ের প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে ঘাটাল চন্দ্রকোণা প্রভৃতি এখন ছানা ও ক্ষীরের ব্যবসা ধরেছেন। কলকাতার বাজারে ক্ষীর-ছানা কাটিয়ে তাঁদের বেশ লাভ হয়, বোধহয় ঘিয়ের চেয়ে বেশি লাভ হয়।

বছর ত্রিশের মধ্যে দেখতে দেখতে কী করে সমস্ত ব্যবসাটা বাঙালির হাতছাড়া হয়ে মাড়োয়ারির কবলে গেল ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বুকটান করে দাঁড়াবার বৃত্তি নেই বাঙালি ব্যবসায়ীর; অসুবিধা দেখলে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই এঁদের প্রবৃত্তি। অন্যদিকে মাড়োয়ারির স্বভাব একেবারে উলটো, তাছাড়া তারা ভারি রক্ষণশীল। যেখানেই ওরা যাক নিজের আচার ব্যবহার বজায় রাখার চেষ্টা থাকে ওদের—কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নিজেদের বামুন, গোয়ালা, হালুয়াই,

স্বর্ণকার, এমনকী পাগড়ি রং করবার জন্য মুসলমানদের পর্যন্ত দেশ থেকে আমদানি করেছে। কেবল সঙ্গে আনা নয়, ব্যবসা দিয়ে এদের এখানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে—এরই নাম সহযোগিতা। পরস্পরকে সাহায্য করা বাঙালির ধাতে বড়ো নেই, যে বিশেষ গুণটি মাড়োয়ারির একেবারে মজ্জাগত। অপরের প্রতিষ্ঠায় আপনারই প্রতিষ্ঠালাভ, অপরকে সাহায্য করার মানে নিজেকেই সাহায্য করা—এই সত্য যতদিন না বাঙালি বুঝবে ততদিন কি ব্যবসার ক্ষেত্রে, কি অন্য ক্ষেত্রে, কোথাও তার যথার্থ কল্যাণের আশা নেই।

মাড়োয়ারির সহযোগিতা-নীতির ফলে কী হয়েছে? কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য যে সব পুরী-মিঠাইয়ের দোকান আছে তার অধিকাংশই অবাঙালির পরিচালিত; মাড়োয়ারিরা নিজেদের মূলধন দিয়ে এইসব দোকানের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। ভেজাল ঘি চালানোর পক্ষে এই দোকানগুলো যে কত বড়ো পথ সে কথা আর বলে দিতে হবে না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কি ঘিয়ের আমদানিকর্তা, কি আড়তদার, কি দালাল, কি পাইকার, এমনকী ঘি বইবার মুটে পর্যন্ত সবাই মাড়োয়ারি কিংবা রাজপুতানা-মাড়োয়ারের লোক,—এর কোনো ব্যাপারে বাঙালির চিহ্নমাত্র নেই। ফলে এই হল, ভেজাল ঘি বন্ধ করায় বাঙালির কোনো হাত তো নেই-ই—এমনকী নিজের খাঁটি ঘি বাজারে চালানো পর্যন্ত বাঙালি ব্যবসাদারের পক্ষে দুঃসাধ্য দাঁড়িয়েছে। কেননা একথা বোঝা শক্ত নয়, যারা ব্যবসার গোটা organisationটাই করায়ত্ত করেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের তারা অনায়াসেই কোণঠাসা করতে পারে, যা খুশি চালানো তাদের পক্ষে অতি সহজ। তা ছাড়া যে ভেজাল জিনিস দেয় সে পুরো দাম নিয়ে অর্ধেক জিনিস দেয় না, (বাকি অর্ধেক তো অপদার্থ করে দেয়ই) সুতরাং তার পক্ষে খাঁটি জিনিসের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় নামা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এবং এই দর কাটাকাটির পাল্লায় কোনদিকে ঝুঁকি হবে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা সুন্দর মুখের মতো সস্তা দামের জয় সর্বত্র।

মাড়োয়ারি আসার আগে একেবারেই ভেজাল ঘি ছিল না একথা বললে ভুল হবে; আগেও ভেজাল চলত, তবে এতটা ফলাওভাবে নয়। তখনকার দিনে মটকিতে তিন থাকে ঘি থাকত, সব নীচে নিকৃষ্ট ঘি, মাঝের থাকে কিছু সরেস, কেবল ওপরের থাকে থাকত উৎকৃষ্ট ঘি। এছাড়াও সে সময়ে বাদাম তেল, কুসুমবীজের তেল ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো হত—কিন্তু এসব ভেজালের প্রাদুর্ভাব খুব কম এবং কদাচ ছিল; কেননা ব্যবসায়ে অসাধুতা তখন এত প্রবল হয়ে ওঠেনি। আজকাল ঘিয়ের সঙ্গে জান্তব চর্বি, ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মেশানো হয়ে থাকে—তখনকার মিশ্রণ-রীতির সঙ্গে এর আকাশপাতাল পার্থক্য। কলকাতায় বহু চর্বির কারখানা আছে, লক্ষ লক্ষ টাকার চর্বির কারবার চলে, এইসব কারবারি কর্পোরেশন থেকে লাইসেন্স নিয়ে পাকা হয়ে খুঁটি গেড়ে বসেছে। এঁদের দৌলতে ঘি আর পেয় পদার্থ নেই, চর্বির সংযোগে তা এখন রীতিমতো চর্ব্য ব্যাপার! সম্প্রতি জাপান থেকে একপ্রকার hydrogenised মাছের তেলের আমদানি শুরু হয়েছে ঘি বা মাখনের সঙ্গে যার ভেজাল ধরবার কোনো উপায় নেই। কিছুদিন আগে বোম্বাই শহরে মাখনের দোকান খানাতল্লাসি করে এই তৈলাক্ত মাখন ধরা পড়েছে, এতদিনে কলকাতার বাজারেও যে এ-বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সাধারণ লোকের ধারণা বাজারে দু-প্রকারের ঘি—শ্রীঘৃত আর বিশ্রী ঘৃত, অতএব ভেজালের হাত থেকে বাঁচতে হলে চেনা মার্কা কেনাই নিরাপদ; কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। শ্রীঘৃত

ছাড়াও অন্য মার্কার খাঁটি ঘি বাজারে আছে এবং এসব ছাড়াও আরেক রকমের ঘি আছে যাকে বিশ্রী ঘৃত অর্থাৎ ভেজাল ঘি-ও বলা চলে না, কেননা আসলে তা ভেজালও নয়, ঘি-ও নয়। ভেজিটেবল প্রডাক্ট বনাম বনস্পতি-ঘিয়ের কথাই এখানে বলছি। কলকাতার বাজারে ভেজিটেবল ঘি বড়ো কম কাটে না : ১৯২৮ সালে ৪২,৬২,২০১ টাকায় ৯৭,০৩১ হন্দর উদ্ভিজ্জ ঘি-এর আমদানি হয়েছিল,—১৯২৯ সালে ৪৩,৪৫,৯৮৫ টাকায় ১,১১,৩৯৯ হন্দর বনস্পতি আসেন; এর আমদানি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথমে ঘিয়ের সস্তা বিকল্প (Cheap substitute) রূপে এর আবির্ভাব হলেও, এখন এ-বস্তু ঘিয়ের প্রধান অনুকল্প (Chief adulterant) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো ছাড়াও ভেজিটেবল ঘি-র এমনই কাটতি আছে, অনেকে ঘিয়ের পরিবর্তে এই উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন, ভেজাল ঘিয়ের চেয়ে ভেজিটেবল ঘি নিরাপদ এবং সস্তাও বটে। কিন্তু দুধের স্বাদ যদি বা ঘোলে মেটে, ঘিয়ের প্রয়োজন কিছু বনস্পতিতে মিটতে পারে না। কেননা উদ্ভিজ্জ ঘিয়ের মধ্যে সেই খাদ্যপ্রাণ নেই যা বিশুদ্ধ ঘিয়ে বর্তমান। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত রাসায়নিকরা একমত যে, যে হাইড্রোজিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেজিটেবল প্রডাক্ট প্রস্তুত হয় তাতে ভিটামিন A বজায় থাকা অসম্ভব, সেই কারণে এই বস্তু বিশুদ্ধ ঘিয়ের বদলে কখনো ব্যবহার্য হতে পারে না। এই হেতু শিশু কিংবা তার মাকে ইহা কদাপি দেওয়া উচিত নয়। শরীর-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সের পক্ষে ভিটামিন-A র একান্ত প্রয়োজন, খাদ্যে এই ভিটামিনের অভাব হলে দেহ পোষণের ক্ষতি হয় এবং ক্ষয়ের কারণ ঘটে।

ঘি আমাদের নিত্য প্রয়োজন, এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য এই ব্যবসায়ে বাঙালির ধনবল ও জনবল কেন বিনিয়োগ করা দরকার, নানাদিক থেকে আমরা তার আলোচনা করে দেখলাম। কেবল ঘিয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষাই নয়, বহু বেকারের আত্মরক্ষাও এই ব্যাপারে নির্ভর করছে। ঘি আর কাপড়, বাঙালির এই দুটি আবশ্যকের ব্যবসা বাঙালির অধিকারে এলে আজ এই মুহূর্তেই এই প্রদেশের অনেক দুর্দশার অবসান হয়। এখানে ঘিয়ের কথাই বলি, এই ব্যবসায় নামতে হলে কীভাবে শুরু করা দরকার।—

প্রথমত, যাঁরা বেকার তাঁরা কয়েকজন মিলে কিছু টাকার জোগাড় করে ঘিয়ের মোকামে নিজেরা যান, সেখানে স্বয়ং পরীক্ষা করে খাঁটি ঘি কিনুন, পরে সেই ঘি আড়াইসেরি টিনে ভরতি করে কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন শহরে, বাড়ি বাড়ি ফিরি-করা আরম্ভ করে দিন। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে একমাত্র মূলধন—মাড়োয়ারি; ফেরিওলা থেকে শুরু করে বলে সেই অভিজ্ঞতার জোরেই একদিন ব্যবসার চূড়ায় উঠে থাকে।

দ্বিতীয়ত, বেকার নন কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাঁরা লাভের ব্যবসায় টাকা খাটাতে চান তাঁরা দল বেঁধে মূলধন জোগাড় করে সমবায় পদ্ধতিতে মাঝারি স্কেলে ঘিয়ের ব্যবসা ফাঁদতে পারেন। তাঁদের রীতিমতো জেনেশুনে এবং তোড়জোড় করে নামতে হবে, তার টেকনিক্যালিটি নিয়ে আলোচনা করবার এ স্থান নয়। তবে একটা কথা, যেখানে ঘিয়ের উৎপত্তিস্থান সেখান থেকে ঘি কিনে টিনে ভরে বাজারে চালান দেবার আগে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। এজন্য কেবল কর্পোরেশনের পরীক্ষা এবং পাসপোর্টের উপর নির্ভর না করে, তাঁদের

শ্রীঘৃতের মতো ঘিয়ের মোকামেই বিশ্লেষণাগার (ল্যাবরেটরি) রাখতে হবে। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব আছে, তার খাঁটিত্বের দিকে লক্ষ না রাখলে চলে না; কেননা এ ব্যাপারে অসাধুতা কেবলমাত্র অসাধুতা নয়, তা হচ্ছে crime against community.

এ পর্যন্ত গেল ঘিয়ের ব্যবসার কথা, কিন্তু এর বাণিজ্যের দিকও আছে—সেদিকে এর সম্ভাবনা প্রচুর। পৃথিবীর লোকেরা এখনো ঘি খেতে শেখেনি, তবে ভারতবর্ষে যে সব বিদেশি এসেছে তাদের অনেকে ঘিয়ের ব্যবহার জেনেছে বটে। যদি কোনো উপায়ে চেষ্টাচরিত্র করে ইউরোপ আমেরিকার বাসিন্দাদের ঘি ধরানো যায় তাহলে ভারতের ভাগ্যে এই সূত্রে যে প্রচুর অর্থযোগ রয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। এখন পৃথিবীর যেখানে যেখানে ভারতবাসী গেছে সেখানে সেখানেই ঘি যায়, কেননা ঘি না হলে কোনোদেশেই কোথাও আমাদের চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, আমেরিকার ব্রিটিশ গায়ানা, কানাডা, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থানে স্থানে ঘি গিয়ে থাকে। বাঙালিদের মধ্যে অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়রা সিঙ্গাপুর, পেনাং, হংকং, সাংঘাই, শ্যাম এবং যবদ্বীপে তাঁদের শ্রীঘৃত রপ্তানি করে থাকেন। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়, বাহিরের এই বাজারকে আরো বাড়াতে হবে, আরো বিস্তৃত করতে হবে— এই জন্য বিদেশির রাজ্যে প্রোপাগান্ডা করা চাই, প্রতিনিধি পাঠানো চাই। আপাতত এই কর্তব্য করবেন বিদেশে যে সব ভারতীয় আছেন তারা—প্রতিবেশীদের কানে চার্বাকের মন্ত্রদানের ভার এখন তাঁদের ওপর। তাঁরা যদি 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই প্রস্তাবে পৃথিবীর লোককে রাজি করাতে পারেন তাহলে তাঁদের স্বদেশবাসীর পক্ষে ওই শ্লোকের 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' এই প্রথম অংশটা পরম সত্য হয়ে দাঁড়ায় অচিরেই।

সম্পাদকীয় সংযোজন : এই লেখাটি যে সময়ের তখন ১ টাকা = ১৬ আনা = ৬৪ পয়সা। অর্থাৎ ১ আনা = ৪ পয়সা/৪ আনা = ১৬ পয়সা/৮ আনা = ৩২ পয়সা/১২ আনা = ৪৮ পয়সা। মূল লেখাটিতে 'আনা' প্রতীকবাচক চিহ্ন ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিন মুদ্রণ পদ্ধতিতে তা অলভ্য। তাই এখানে বর্তমান রীতি অনুসরণ করা হল।

বানানরীতি বর্তমান অনুসারে পরিবর্তিত।

প্রথম প্রকাশ : *বিচিত্রা*/কার্তিক ১৩৪০/সপ্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা/সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা : প্রসূন রক্ষিত।

নিবারণের নিমন্ত্রণ রক্ষা

শিবরাম চক্রবর্তী

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নিবারণ আবার আমায় ফোন করল—আমার বন্ধু নিবারণ।

'ভাই শিবরাম, যদি তুমি ঘন্টা দু-একের জন্য একবার আসতে পারো তাহলে—তাহলে—এত বাধিত হই যে কী বলব! তোমার পোর্টেবল বাংলা টাইপরাইটারও হাতে করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ—আর যদি ভালো রাইটিং প্যাড থাকে—আছেই নিশ্চয়ই তোমার! গল্প লেখার বদভ্যাস রয়েছে যখন!—সেটাও সঙ্গে আনতে ভুলো না! নিদেনপক্ষে ডজন দু-তিন চিঠির কাগজ হলেও চলবে, খুব ডিসেন্ট হওয়া চাই কিন্তু।'

'ভাই নিবারণ—' বলে শুরু করেছি, আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। টেলিফোনের কানেকশন কেটে দিল মাঝখান থেকে। কিংবা, নিবারণই নিজে, রিসিভার নামিয়ে রেখে আমাকে নিবারণ করল কি না কে জানে! বলতে যাচ্ছিলাম যে তক্ষুনিই বাড়ি ছেড়ে বেরুনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হাতে কাজ রয়েছে, গল্প লেখার কাজ, হয়তো এমনি কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ওজর-আপত্তি নিবারণের কাছে নিষ্ফল। কোনোদিনই সে-সবে সে কর্ণপাত করে না—টেলিফোনে আরো কম।

নিবারণ ছাড়াও যে আমাদের আর কোনো প্রিয়জন কিংবা প্রয়োজন থাকতে পারে, এটা ওর ধারণার বাইরে, চিরদিনই তাই দেখে আসছি। কাজেই কোনো অজুহাতেই যখন পার নেই, পোর্টেবলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল।

'সত্যি! ভারি লক্ষ্মীছেলে তুমি!'—আমাকে দেখামাত্রই নিবারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: 'তোমার মতো বন্ধু হয় না! আজকালকার জড়বাদী জগতে সবাই আত্মসর্বস্ব। পাড়ার লোকেরা যখন আমার কাছে বন্ধুদের স্বার্থপরতার কথা পাড়ে, আমার চোখ সজল হয়ে ওঠে, আমি তাদের বলি, তোমরা আমাদের শিবরামকে দ্যাখোনি, শিবরামকে চেনো না, তাহলে বলতে না এ কথা। বন্ধু বলতে কী বোঝায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ হচ্ছে ওই শিবরাম! আমাদের মূর্তিমান শিবরাম! যাক, এখন চট করে বসে পড়ো তো! আমার কয়েকটা চিঠি টাইপ করে দাও, কেমন? বলব কী, ক-দিন থেকে আঙুলে এত ব্যথা যে কলম ধরতে পারছিনে!'

এই বলে কাগজ পাকিয়ে, ভার্জিনিয়া টোব্যাকো ভরে সিগ্রেট বানিয়ে সে টানতে শুরু করে দিলে—তার ব্যথিত আঙুলের সাহায্যেই।

'একটা সার্কুলার লেটারের মতো হবে—' নিবারণ বিবৃত করে : 'বুঝলে কিনা! কিন্তু সবগুলোই আলাদা আলাদা টাইপ করা চাই। সার্কুলার চিঠি বলে জানতে দিতে চাইনে কাউকে। তা ছাড়া, "প্রিয় মহাশয়" দিয়েও শুরু করা চলবে না—একটু ব্যক্তিগত, একটু ঘনিষ্ঠতাজ্ঞাপক করতে চাই চিঠিগুলোকে। যেমন ধরো, ভাই মেঘেন, কিংবা, প্রিয় জগদিন্দ্র, এই ধরনের, বুঝলে কিনা!'

'খুব লম্বা চিঠি নাকি? আশঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করি।'

'না, এমন আর কী বড়ো!' নিবারণ বলে : 'এই আধ পাতাটাক কেবল!—'

আমার গলা ঘড়ঘড় করে ওঠে : 'কতগুলো করতে হবে?'

'আমি বেশি কষ্ট দেবো না তোমায়,' দয়ার্দ্র কণ্ঠ নিবারণের : 'ডজনখানেক করে দাও আজ রাত্রে। তাহলেই হবে। তুমি তো জানো, বন্ধুদের ওপর আমি আনডিউ অ্যাডভ্যানটেজ নিতে একদম ভালোবাসিনে। আমার কাজ করে কৃতার্থ হবার তোমার যতই উৎসাহ থাক না কেন, তোমাকে বেশি খাটাবার আমার আগ্রহ নেই। তোমার মতো বন্ধুত্বের একেবারে আদর্শস্থল না হতে পারি, তবে আমি—আমিও—হ্যাঁ, আমিও তোমার চেয়ে নেহাত কম যাইনে! উপরোধ করে একজন প্রাণের বন্ধুকে ঢেঁকি গেলাব সে পাত্র নই আমি।'

'হয়েছে হয়েছে! আর বলতে হবে না—' আমি বাধা দিয়ে বলি— 'নিজের প্রশংসা শুনতে আমার লজ্জা করে।'

'তাহলে, আমি বলে যাচ্ছি, তুমি আরম্ভ করো। যদি প্রথম ডজনখানেক পাঠিয়ে কোনো ফল না হয়, তখন আবার আর একদিন তোমায় ফোন করব। এসো তখন।'

নিবারণ আর আমি একসঙ্গে আরম্ভ করি। নিবারণ যা কথায় বলে, আমি তা কাজে পরিণত করতে সচেষ্ট হই।

ভাই জগদিন্দ্র,

সেবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হল, সেই যখন তুমি কলকেতায় এসেছিলে, তুমি আমাকে গরমের ছুটিটা তোমাদের কালিমপঙের বাড়িতে কাটাতে বলেছিলে। সেজন্যে আমি কৃতার্থ। তোমার অনুরোধ রাখতে পারলে সত্যি আমি খুব সুখী হতাম, বলতে কি, এই গরম কালটা কালিমপঙে কাটানোর মতো আরামের আর কিছুই হতে পারে না, অতীব আনন্দের সঙ্গেই আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতাম, কিন্তু ভাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের মেঘেন, আমাকে আগে থাকতেই, তাদের পুরীর বাসাতে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটাবার কথা বিশেষ করে জানিয়ে রেখেছে, তার নিমন্ত্রণ না রাখলে সে ভারি দুঃখিত হবে, অতএব, তোমাদের ওখানে যেতে পারলাম না এজন্যে কিছু মনে কোরো না ভাই।

ভালো কথা, ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমার কবিতার বই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তুমি পেয়েছ কি না জানিনে। কবিতাগুলো তোমার কেমন লাগল, জানালে সুখী হব। ইতি—

তোমাদেরই—

শ্রীনিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

'তুমি কী বলতে চাও যে সত্যিই তোমাকে একজন লোক নেমন্তন্ন করে রেখেছে? গরমের ছুটিটা তাদের ওখানে কাটাবার জন্যে?'

'তোমার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে,' নিবারণ ভারি গম্ভীর হয়ে যায় : 'কেন? আমাকে কি কেউ নেমন্তন্ন করে না? করতে নেই কি? আমি নিমন্ত্রিত হবার অযোগ্য? না, আমাকে নিজেদের মধ্যে পেলে কারো খুশি হয়ে ওঠবার কথা না? না, যেখানে আমি যাই, যাদের সঙ্গে মিশি, তারা সবাই মিইয়ে যায়—দমে যায়—ভড়কে যায় আমাকে দেখলেই? অর্থাৎ আমি তাদের আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারিনে? কী বলতে চাও তুমি? শুনি? এরকম বক্র ইঙ্গিত করার মানে?

আমি কোনো জবাব দিতে পারিনে।

'তবে, হ্যাঁ, সত্যি কথা জানতে চাও যদি—' নিজে থেকেই বলে নিবারণ : 'তাহলে বলতে হয় একটাও নেমন্তন্ন আমি পাইনি এখনো। আদপেই না। এমনকী, মেঘেন হতভাগারও না! যে রকম চালাক ছেলে—সে নেমন্তন্ন করবে? সেই কারণেই তো এই সার্কুলার চিঠি পাঠানো, যাতে একটা-না-একটা এসে জুটে যায়।'

'বুঝতে পারছিনে।' আমি বলি : 'এভাবে যে কী করে নেমন্তন্ন বাগাবে, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির বাইরে।'

'এই ধরনে হবে, বুঝলে কিনা—' নিবারণ বিশদ করতে চেষ্টা করে :

'জগদিন্দ্রের কথাই ধরো। বড়দিনের বন্ধে ও যখন কলকেতায় এসেছিল তখন বহুবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কত জায়গাতেই না! এবং কত কথাই না হয়েছে আমাদের মধ্যে। কত কী বিষয়েই না আমরা আলোচনা করেছি। সেইসব কথাবার্তার ফাঁকে-ফোকরে, সে যে ঘুণাক্ষরেও কখনো, গ্রীষ্মের ছুটিটা তাদের কালিমপঙে কাটাবার আভাস আমাকে দ্যায়নি, এ কথা সে ধারণা করেই উঠতে পারবে না। তার বিশ্বাস হবে যে সত্যিই সে আমাকে নেমন্তন্ন করে ফেলেছিল, হয়তো কোনো অসতর্ক অবস্থায়। এমনও হতে পারে যে, যখন আমি তার প্রবন্ধগুলোর প্রশংসা করছিলাম—তার সেই অখাদ্য লেখাগুলোর—সেই দুর্বল মুহূর্তেই সে এই দুর্ঘটনা করে বসেছে!—'

'জগদিন্দ্রের প্রবন্ধের—?' আমার দম আটকে আসে : 'কী করে প্রশংসা করলে? ধৈর্য ধরে পড়তে পেরেছ তুমি?'

'পড়বার দরকার হয় না। না পড়েই প্রশংসা করা যায়। তোমার গল্পই কী আমি পড়ি? কিন্তু না পড়েই বলে দিতে পারি, তোমার গল্পও তার প্রবন্ধের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়।'

নিজের নিন্দাতেও আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি—নিন্দা, প্রশংসা আমার কাছে সমান। প্রসঙ্গটা আমি পালটাতে চাই : 'না হয়, জগদিন্দ্রের ধারণা হল যে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে কিন্তু তাতেই বা কি? তুমি তো আর তার কাছে যাচ্ছ না। অর্থাৎ যেতে পারছ না—মেঘেনের কাছেই তোমাকে যেতে হচ্ছে, তুমি জানিয়ে দিয়েছ।'

'আহা, এর একটা জবাব আসবে তো? তাতে জগদিন্দ্র আমাকে জানাবে যে আমার কবিতার বই সে পায়নি। বলা বাহুল্য, আমার কবিতার বই তাকে আমি পাঠাইওনি।'

'তবু আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, এতে করে তোমার কী যে সুবিধে হবে।' সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়ি।

'তোমার বোঝবার দরকার করে না। ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি থাকলে তো বুঝবে? সারারাত তোমার সঙ্গে বকাবকি করে কাটাই আর আমার কাজ এদিকে পণ্ড হোক?—' নিবারণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে : 'নাও আমার চিঠিগুলো চটপট সেরে ফ্যালো দেখি। তারপর দিন সাতেক পরে এসে খবর নিয়ো, বুঝিয়ে দেবোখন তখন। তোমাদের বুদ্ধি অনেকটা মেওয়ার মতো, সবুরে ফলে।'

দিন সাতেক পরে খবর নিতে গেলাম।

'জবাব এসেছে একটা,' বলল নিবারণ, হাসিমুখেই বলল : 'শিলং-এর বটকেষ্টর কাছ

থেকেই এসেছে। আমাদের বটকেষ্ট গো? যার ধারণা যে সে নাটক লিখতে পারে। খানকতক লিখেওছে, কলকাতার থিয়েটারগুলোয় প্লেও হয়েছে নাকি, শুনতে পাই।'

'হ্যাঁ, জানি।' আমি বলি : 'খুব খারাপ লেখে না নেহাত। তোমার কবিতার মতোই উপাদেয়। কেবল কান পেতে শোনাটাই কষ্টকর, এই যা!'

'আমার কবিতার তুমি বুঝবে কী? কবিতা বোঝা অত সোজা নয় হে! তোমার গল্পের মতো না, যে লিখে ফেললেই হল। মিল খুঁজবার জন্যে তিনখানা ডিকশনারিই রাখতে হয়েছে, রীতিমতো।' ঠোঁট উলটে জানিয়ে দ্যায় নিবারণ।

'আমি কী বলেছি যে সোজা? যা শুনতেই অত কষ্ট তা লিখতে না জানি কী! সে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু যাক, বটকেষ্ট কী লিখেছে শুনি?'

'লিখেছে যে,—এই দ্যাখো না!—' চিঠিখানা ফেলে দেয় আমার দিকে। সাফল্যগর্বে ওর সারা মুখ সমুদ্ভাসিত। পড়ে দেখি :

ভাই নিবারণ,

গ্রীষ্মকালে তুমি আমাদের শিলং-এ আসতে পারবে না জেনে আমরা যে কী দুঃখিত হয়েছি তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। তোমার সঙ্গলাভের আনন্দ যে একবার পেয়েছে সেই জানে। তোমাকে আমাদের সান্নিধ্যে পাবো জেনে সত্যিই আমরা লালায়িত হয়েছিলাম। কিন্তু, আমরা বুঝতে পারছি যে মেঘেনকে হতাশ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এবং সেটা উচিতও নয়, আমাদের মতে। কেননা, মেঘেন আমাদের বন্ধু, সে ভাবতে পারে, আমরা তোমাকে ভাঙিয়ে নিলাম, সেটা ভালো দেখায় না। আশা করি পুরীতে তোমার আরামেই ছুটিটা কাটবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার কবিতার বইটি কিন্তু আমরা পাইনি। ইতি—

ভবদীয়—
বটকৃষ্ণ গাঙ্গুলি

পড়লাম, পড়ে বুঝলাম, যতটা বোঝা আমার ক্ষমতার মধ্যে। কিন্তু এহেন দায়সারা চিঠি পেয়ে, নিবারণ এতখানি উৎসাহিত কেন কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

'বেশ তো! তাতে কী? জিগ্যেস করি।'

'বটকেষ্টকে আমার কবিতার বই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর লিখে দিয়েছি, মেঘেনের ছেলেমেয়েরা হামে পীড়িত, মেঘেন জানিয়েছে। অতএব শিলং-এ যেতে আমার কোনো বাধা নেই।'

নিবারণের বাহাদুরিতে আমি হাঁ করে থাকি। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বলি : 'তাহলে আজই তুমি রওনা হচ্ছ? কী বলো?'

'না আজই নয়। আরো খানকতক জবাবের অপেক্ষা করছি। খানছয়েক পাবো আশা করি। তার ভেতর থেকে যাদের বাড়ি রান্নাবান্না ভালো এবং ঝালটাল একটু কম খায়—এইরকম একটা বেছে নিতে হবে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সোজা নয় তো!'

সম্পাদকীয় সংযোজন : বানানরীতি বর্তমান অনুসারে পরিবর্তিত।
প্রথম প্রকাশ : *রং মশাল*/ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭/পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা/সম্পাদক—হেমেন্দ্রকুমার রায়
সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা : প্রসূন রক্ষিত।

ফিরে দেখা

গল্প

কবিতা

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

পাখি-ওড়া ছায়া

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

—ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

আজ মীনাক্ষী বাড়ি নেই। বিশিষ্ট সাহিত্যিক চঞ্চলকুমার ভাদুড়ি আজকাল আর পারতপক্ষে ফোন ধরেন না। ধরেন না বলতে, ডাইনিং স্পেসের ক্যাবিনেটে রাখা ফোন পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁর ক্ষেত্রে আট থেকে দশ রিঙিং পর্যন্ত দেরি হয়ে যায়। অথচ ফ্ল্যাট ৬৫০ স্কোয়ার ফিটের। এবং রিসিভারের দূরত্ব ৫ গজের বেশি হবে না। তুলনায় স্ত্রী মীনাক্ষী তিন বার বাজার আগেই ফোন ধরে থাকেন, সে ফ্ল্যাটের যেখানেই তিনি থাকুন না কেন। কেননা, ৭-৮ বার বাজার মধ্যে ফোন না ধরলে ওদিকেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তারা ফোন কেটে দেয়। এভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়ে গেছে মীনাক্ষীর।

এ নয় যে সাহিত্যিক বার্ধক্যরোগে আক্রান্ত। লোকে যারা জগিং করে তাদের মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন ৫৫ বছরের যুবককে পাওয়া যাবে। বয়স হলেও তাঁরা কেউ তাঁর মতো নয়।

—ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

আসলে বয়স তো নয়। অবসাদ। ম্যানিয়াক ডিপ্রেশন। আর, অনন্তশয্যায় এই যে শয়ন তাঁর, এ কি সাধ করে!

আজকের কাগজের খবরটাই ধরা যাক না কেন। কামসূত্র কন্ডোম যারা তৈরি করে[১], ব্যাবসার খাতিরেই নিঃসন্দেহে, তারা একটি সমীক্ষা করিয়েছে। পড়ে দেখলেন চঞ্চলকুমার, যৌন ব্যাপারে সমস্ত গোঁড়ামি ঝেড়ে ফেলে অন্তত নাগরিক ভারতীয়রা এক অত্যন্ত খোলামেলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ২ লক্ষ দম্পতির বৈধ যৌনাচরণ সম্পর্কে যেসব তথ্য ওই সমীক্ষায় বেরিয়েছে, তা স্তম্ভিত করে দেবার মতো। যেমন শতকরা ৪৭ জন বিবাহিতা জানিয়েছেন, তাঁদের বিবাহপূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা ছিল। এমনি আরো অনেক বিস্ফোরক উন্মোচন থাকা সত্ত্বেও যে-তথ্যটি চঞ্চলকুমারকে সবচেয়ে বেশি ভিটে-ছাড়া করেছে তা হল, ওই ২ লক্ষের মধ্যে ১৮ থেকে ৫৫ বয়ঃসীমার মধ্যে শতকরা ৬৫ জন দম্পতি সপ্তাহে ৬ বার নৈশ, ছুটির দিনে একবার দ্বিপ্রাহরিক সহবাস করে থাকেন।[২]

অথচ, শেষের কবিতা-ফবিতা যদি হিসেবে নাও ধরা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্যেও তো এ-সব ব্যাপারে, দিবা দূরস্থান, রাত্রিযাপন নিয়েও টু-শব্দটি নেই। আর ওদেরই বা কেন মিথ্যে অপবাদ দিই। সে-অপরাধে তো আমিও অপরাধী।

৭২খানা বই লিখেছি। তার মধ্যে অর্ধ-শতাধিক শুধু উপন্যাস। কই, নর-নারী বিছানায় কী করে থাকে—কিবা দিন, কিবা রাত—সে নিয়ে একটি প্যারাগ্রাফ তো আমারো নেই কোথাও! সে-সব কথা কি তা হলে ভবিষ্যতের ভারতীয় নারী-লেখকদের জন্যেই বরাত দেওয়া রইল? আনসেল কোম্পানির সমীক্ষা তো সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

---

১. জে কে আনসেল লিমিটেড

২. *দি এশিয়ান এজ*, ২৬ জুন, ২০০২

—ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

বস্তুত আজকের সমীক্ষা-রিপোর্টটি লাংসের গভীরতম বায়ুথলি থেকে উঠে এসে একটি দীর্ঘশ্বাসে তাঁর গোটা যাপিত জীবনকে যেন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গেছে এ-ব্যাপারে।

তাঁর সাহিত্যিক ব্যর্থতার জন্যই যে এই দীর্ঘশ্বাস, তা শুধু নয়।

সেটা একটা কারণ হলেও, গুরুত্বে তেমন কিছু নয়। কেননা, লেখক, শিল্পী, গায়ক, কতই তো আসে এক-একটা সময় জুড়ে। সকলেই তো কবি নয়, কবি বলে গেছেন, কেউ কেউ কবি। অথবা, পিতৃলোক হেসে ভাবে কাকে বলে গান, আর কাকে সোনা-তেল-কাগজের খনি— এ-সব—তো বলাই আছে।

খেলতে চেয়েছিলাম, খেলতে এসেছিলাম, খেলতে নেমেছিলাম; কিন্তু হিটেই উঠতে পারিনি। এই তো বৃত্তান্ত? কিংবা কে জানে, হয়তো খেলতেই আসিনি। হয়তো নন-ইভেন্ট। এমনও তো আছে কত। শশধর দত্ত। ২৭২ গ্রন্থ-প্রণেতা। নন-ইভেন্ট। বেন হার। ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮, ৩ বছরের বিক্রি ৩০লক্ষ। তবু নন-ইভেন্ট। কেউ জানে না, লেখকের নাম কী।

তাই, এ-সব ব্যর্থতার আদৌ কোনো দীর্ঘশ্বাস-যোগ্যতা আছে কি?

আসল কারণ অন্য। ওই রিপোর্ট পড়ে আজ তাঁর মেধার কথা মনে পড়ে গেছে। অথচ, মেধা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশিত কামসূত্র-তথ্যের একেবারেই বিপরীত মেরুতে।

—ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

সাহিত্যিকের ৪৮ বছর বয়সে মেধা মানজালি এসেছিল অল্প সময়ের জন্য। নয়-নয় করেও চঞ্চলকুমারের জীবনে নারীর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জনের মতো হবে— আর তাদের প্রত্যেকেই যে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, এমন নয়। সব সময় তাঁদের সকলের নাম পর পর মনেও পড়ে না। মেধা মানজালি এই দ্বিতীয় গোত্রে পড়ে। অর্থাৎ সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু সহবাস হয়নি। তারপর, মাঝখানের ৪টি বছরই বলে দিচ্ছে, তাঁর নারী-স্মৃতিতে যদি একটিও অর্গ্যাজম থেকে থাকে, তা ওই জীবনের মাত্র ১৫ দিনের মেয়েটিকে ঘিরে।

মেধার সঙ্গে চঞ্চলকুমারের দেখা হয়েছিল কোট্টায়মের মহাত্মা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটির একটি আড্ডায়। অধ্যক্ষ রবিচন্দ্রন একাধারে কবিও—বাংলা আধুনিক কবিতার দিকটা তাঁর খানিক জানা আছে। তারাতলার সাহিত্য আকাদেমিতে কেরল থেকে বলতে এসে, মৌখিক আমন্ত্রণের সময়, 'আড্ডা' শব্দটি বাংলায় উচ্চারণ করে বলেছিলেন—এই ১৫ দিন আপনাকে আড্ডাই দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। 'নট হোয়াট উই ইউজুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইন্টার-অ্যাকশন ইন সেমিনারোলজি।'

কোট্টায়মের এম.জি.ওপেন ইউনিভার্সিটি একটা ছোটো টিলার ওপর ছড়িয়ে। সেখান থেকে যতদূর দু-চোখ যায়, শুধু শ্যাওলার সর-পড়া জল। গাড়িতে পাহাড়ে উঠতে-উঠতে রবিচন্দ্রন বললেন, 'এই সেই ভেনিস অফ দা ইস্ট। ৯০০ মাইল শান্তি ও কল্যাণ। কেরালার বিখ্যাত ব্যাক-ওয়াটার। এর মধ্যে অনেকগুলো দ্বীপও আছে।'

আড্ডার মেজাজ গুরুতেই যাতে এসে যায়, সেজন্য প্রথম ক্লাস নিতে হয়েছিল ক্যাম্পাসের কফি কর্নারে। প্রথমদিনে সবার আগের যে এসেছিল, সে মেধা। আর সে এসেছিল দু-বেণী দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে। পরনে ছিল নীল ভেলভেটের স্কার্ট।

'শি হ্যাজ অলরেডি এস্ট্যাবলিশড হারসেলফ অ্যাজ এ মাইনর পোয়েটেস।' ঠাট্টা করে বললেন রবিচন্দ্রন।

প্রথমদিনেই প্রথম প্রশ্ন ছিল মেধার, 'স্যার, এখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেমন লিখছেন?'

চঞ্চল বিষাদময় মুখে দু-দিকে ঘাড় নাড়লে মেধা জানতে চাইল, 'উনি কি প্রেম ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে লিখে থাকেন?'

ইংরেজিতে কথা হচ্ছিল। এইখানে রবিচন্দ্রন মালয়ালমে ওকে যা জানালেন, চঞ্চল তার মানে বুঝতে পারলেন। কেননা, শুনে মেধার মুখটা এতটুকু হয়ে গেল।

'ও আপনি জানেন না, না?' রবি বললেন, 'এখানে দু-পাশে মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ। মাথা যখন ওপর-নীচে, তখন, না। ও তাই প্রথমে বুঝতে পারেনি যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন।'

পাশের একটি টিলার মাথায় আর ক-জন ছেলে-মেয়ে দেখা গেল। রবি বললেন, 'ওই যে, ওরা আসছে।'

পরদিন সকালবেলা দু-জন বন্ধুর সঙ্গে মেধা ওঁর কাছে এল। ক্যাম্পাসের মধ্যে ছোটো ফ্ল্যাট দিয়েছে অতিথি-অধ্যাপককে। কিচেনেট-এ গিয়ে মেধা চা করে আনল। রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলতে বলল। কেতকী কুশারী ডাইসন সম্পাদিত ভিক্টোরিয়ার জার্নাল পড়ে যা মনে হয়, বলল। জানতে চাইল, রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স কত?

চঞ্চল বললেন, '৬৩।'

'আর ভিক্টোরিয়া?'

'৩২ হবে।'

'তা হলে আর এমন কী বয়স।'

চঞ্চল বললেন, 'কার?'

মেধা বলল, 'কেন রবীন্দ্রনাথের!'

দু-দিন পরে ছিল স্টিমারে কোচি। প্রেস ক্লাবে মালয়ালম লেখকদের সঙ্গে সভা। এক ঘণ্টার জার্নি। রবিচন্দ্রন বললেন, 'মেধা সঙ্গে যেতে চাইছে। তোমার আপত্তি আছে।'

জলের ওপর ডেকে বসে অনেক কথা হল মেধার সঙ্গে। বেশিটাই রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পো নিয়ে। একটা রক্তমাংসের সম্পর্ক হল না কেন। বিশেষত, ভিক্টোরিয়া তো স্প্যানিশ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙালি। তদুপরি গুরুদেব। বললেন চঞ্চল।

'খুব তো সুন্দরী ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আর বিদুষী।' বলতে বলতে চঞ্চল দেখলেন, কোথা থেকে উড়ে এসে দুটি অভ্রবিন্দু মেধার দু-চোখ জুড়ে বসে গেছে।

ক্যাম্পাসের ফ্ল্যাটে মেধা একা-একা আসা-যাওয়া শুরু করল। চার বছর আগে চঞ্চলের অ্যাকাডেমি পাওয়া বইটি (*অস্তিত্ব অতিথি তুমি*) এখনো মালয়ালমে আসেনি। ইংরেজি থেকে মেধা অনুবাদ করতে চায়।

চঞ্চল বললেন 'হ্যাঁ।'

স্ত্রী মীনাক্ষী মিউজিয়ামের আর্কিওলজি বিভাগের প্রধান। শুধু সেজন্য নয়। আর্কিওলজির সঙ্গে শুধু ইতিহাস নয়, চলমান জীবনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। আবর্জনার স্তূপের নীচে জীবনেরও কত কিছু লুকিয়ে থাকে না? তারা উঠে আসে।

আসার দিন সকালবেলা। প্লেন দেড়টার সময়। এয়ারপোর্ট এক ঘণ্টা দূরে। রবিচন্দ্রন গাড়ি পাঠাবেন সাড়ে ১১টায়।

ফ্ল্যাটে ঢুকে ল্যাচ-কী বন্ধ করে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেধা। মাথা নিচু। মুখ টকটকে লাল।

'ফের ছুটতে ছুটতে এসেছ তুমি?' সস্নেহে বকুনি দিলেন চঞ্চল।

মাঝখানে হাতখানেকের ব্যবধান। মেধা চুপ। চঞ্চলও চুপ।

হালকা আলিঙ্গনে চঞ্চলকুমার তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে শিরস্পর্শ করলেন। দেখা গেল, বুকদুটি দূরে রাখার তার একটুও ইচ্ছা নেই। যদিও চুম্বন এড়াতে সে রেখেছিল মুখটা ঘুরিয়ে। অথচ, চঞ্চল তার শ্যাওলা-রঙা স্টোনওয়াশ টপের দু-একটি বোতাম খুলতে চাইলে সে কিছুতেই খুলতে দিল না। অবশ্য, পীড়াপীড়ি করেননি তিনি। সে-বয়স আর নেই, যদিও রবীন্দ্রনাথের ৬৩-র তুলনায় তাঁর বয়স মাত্র ৪৮, কিন্তু ব্যবধান সেই একই অর্থাৎ সেই ৩০-এর ফের। রুপালি ভেলভেটের নীচে শুধু তার বাম স্তনটি সে আদর করতে দিয়েছিল।

হাত দিয়ে ধরে চঞ্চলের ডানহাতটা সে বারবার তার বাম স্তনের ওপর রাখছিল।

'নিঙ্গল প্রেমত্তিল বিশ্বেসক্কু নুন্দো?'

'ডু ইউ বিলিভ ইন লাভ?' কত গভীরভাবে জানতে চেয়েছিল ওইটুকু মেয়ে।

চঞ্চলকুমার মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেই বুঝতে পারলেন 'না' বলা হয়ে গেছে।

— ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...ক্রিরিরিং...

অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। আবার বাজছে। হঠাৎ মনে হল চঞ্চলের। আরে, এ-তো ট্রাঙ্ককলের আওয়াজ!

— হ্যাঁ। বলুন।

— মি. ভাদুড়ি স্পিকিং?

— ইয়েস প্লিজ।

— গুড ইভনিং স্যার। স্পিকিং ফ্রম তিরবনন্তপুরম মেডিক্যাল হসপিটাল। ডা. ও. পি. নাইয়ার।

...আমার একজন পেশেন্ট। মেধা মানজালি। আপনি চেনেন তাকে? তার ম্যামালোস্কোপি হয়েছিল। এবং বাঁ-দিকের ব্রেস্টে কার্সিনোমা পাওয়া যায়। না-না, প্রথম না। ডান স্তন ৫ বছর আগে আমিই কেটেছিলাম। যা হয়, ওখানে রাবারব্রেস্ট ব্রেসিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার মেটাস্টেসিস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই কিছুই করা গেল না।

...আপনার সঙ্গে পেশেন্ট কথা বলতে চেয়েছিল। আমাকে ফোন নম্বরও দিয়েছিল আপনার। তবে তখন মাথাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সে-সুযোগ দেওয়া যায়নি। আর এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবিনি। যদি হঠাৎ মরে যায়, আপনাকে জানাতে বলেছিল। আমি আমার কর্তব্য করলাম।

আচ্ছা, বাই। গুড নাইট।

আর্কিওলজির সঙ্গে জীবনের একটা সম্বন্ধ আছে। ইউফ্রেটিস নদীর ধারে উর অঞ্চলে যখন খনন কাজ চলছিল, ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের সামনে সবার আগে উঠে আসে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেকার সুমের সভ্যতা থেকে, দু-জনে শোবার একটি দাম্পত্য বিছানা।

বিছানাটি অটুট অবস্থায় পাওয়া যায়। এটা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি, ১৯২২ সালে স্যার হাওয়ার্ড কার্টার যখন টুটানখামুনের সমাধি আবিষ্কার করেন, মাঝখানে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে—তরুণ ফারাও-এর কণ্ঠে বালিকা বধূর পরিয়ে দেওয়া মালাটি তখনো তাঁর গলা থেকে ঝরে যায়নি। আজ ৫২ বছর বয়সে সাহিত্যিক চঞ্চলকুমারের মাথার ভিতরে আর-একবার সেই অনির্বচনীয় অর্গ্যাজম হল—যা শুধু প্রত্ন-ই দিতে পারে।

---

* গল্পের নাম শঙ্খ ঘোষের পঙ্‌ক্তি থেকে।

সম্পাদকীয় সংযোজন : গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪০৯ সালের শরৎকালীন সংখ্যায়। আমাদের মতে এই গল্পটি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় রচিত শীর্ষস্থানীয় গল্পগুলির অন্যতম এবং সেই বছরে পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত যাবতীয় গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প তো বটেই। যে কোনো কারণেই হোক, সেই বছরে গল্পটি খুব বেশিসংখ্যক পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়নি, যা পাঠকদেরই দুর্ভাগ্য। আশা করি এবার অন্তত সন্দীপনের রচনা-প্রিয় পাঠকেরা এই গল্পটি পড়ে নেবেন।

দুটি কবিতা

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

পুষ্প প্রদর্শনী

১

আমার ধারণা ছিল বারান্দার গ্রিলে জুঁই গাছটা মরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অনেকগুলো ডাল শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। শেষে গুঁড়ির দিকে সবুজটুকুও সরিয়ে যখন খয়েরি হতে শুরু করল, আশা বলতে আর কিছুই রইল না।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। আজ সকালে অনেক নতুন মুখ দেখি ডালে ডালে। যদিও ফুল না, আপাতত পাতা। ওহো, অধিকারবোধ কী ভয়ঙ্কর জিনিস। এত যে উৎফুল্ল লাগল, গাছটি আমার বলেই তো। অন্যের টবেও তো এ-জিনিস ঘটে। লক্ষ্য তো করি না।

২

কালীঘাটে সঞ্জয়ের বাড়ি যেতে দেড়হাত চওড়া গলি।

রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন সকাল ৮টা। গলির হ্যালোজেন আলোদুটি এখনো নেবানো হয়নি। আকাশ আবার ঝুলে পড়ছে মেঘে।

এবড়ো-খেবড়ো গলির অন্ধকারে গোষ্পদ জলের ওপর পড়ে আছে ক-টি আলোর ভুঁইচাঁপা। এরা ফুল নয় এ-কথা সত্যি না। যে-কারণে এদের একটিকেও আমি মাড়াতে পারি না।

ঈশ্বর ও জ্যোৎস্না

কালো কুচকুচে জ্যোৎস্না কি হয় না?
আমাদের নার্সিংহোমের মাসির নাম
জ্যোৎস্না। সে আবলুসগাত্রী।

সুইপার — ঈশ্বর
বয়েস কুড়ি/বাইশ।
চেহারাটি হেড়ো,
বেড-প্যান থেকে আমার বাহ্য
তার হাত কমোডে ঢালতে ঢালতে
সে মাসিকে বলে —
কতবার বলি
আমাকে একটা ভালো কাজ দেখে দাও ভাগোয়ান...
মাসি — সবই ভাগ্য বাবা।

এই লেখালেখির কাজটা
আমারও পছন্দের নয় কোনোদিনই
ভগবান আমাকেও একটা
ভালো কাজ দিলে পারতে।

লাইফ লাইন নার্সিংহোম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪

সম্পাদকীয় সংযোজন : এই কবিতা দুটির প্রেস-কপি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় নিজের হাতে করে উঠতে পারেননি। তার খাতা থেকে (যখন অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর হাতের লেখা প্রায় দুর্বোধ্য) কবিতা দুটি কপি করে এনেছিলেন প্রধান সম্পাদক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

শিল্পভাবনা

মনসিজ মজুমদার
হিরণ মিত্র

এই দুটি রচনা সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত। রচনাদুটি মুদ্রণের অনুমতির জন্য আমরা লেখক ও আকাদেমি কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

নির্বাক কবিতা, সবাক ছবি

মনসিজ মজুমদার

সঙ্গীত এবং চিত্রকলার চেয়ে বয়সে ছোটো কাব্যকলা বা সাহিত্য। বোধহয় যতদিন না মুখের ভাষা লিখিত রূপ পেয়েছে এবং চিত্রাক্ষর থেকে লিখিত ভাষা ধ্বনি-অনুসারী বা ফোনেটিক হয়েছে ততদিন কাব্য বা সাহিত্য ছিল চিত্রকলা বা সঙ্গীতনির্ভর। কিন্তু সব শিল্পের ইতিহাস এই যে সূচনাকালে তার পরশিল্পনির্ভরতা থাকে। নানা যুগে কবিতা ও সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্য, ফিল্ম ও সাহিত্যের পরস্পরনির্ভরতা এই ইতিহাসের দৃষ্টান্ত।

অন্যভাবেও সব শিল্পের মধ্যে এক সাধারণ সাযুজ্য এসে যায় এক যুগের সামগ্রিক জীবনভাবনা বা বোধ থেকে। আধুনিকতা যেমন কেবল সাহিত্যের বা কলাশিল্পের একচেটে কারবার নয়, আধুনিককালের যে-কোনো শিল্পেই আধুনিক জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে আঙ্গিকে, স্টাইলে, বিষয়ে, সেইজন্যে এক এক যুগের সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রকলা সঙ্গীত সব কিছুরই এক সামান্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবেই। ইউরোপে মধ্যযুগে, রেনেসাঁস, বারোক, রোকোকো, নিও-ক্লাসিকাল, রোমান্টিক সব যুগেই কাব্য, সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য; সব শিল্পেই সৃষ্টির প্রেরণা, স্টাইল, নির্মিতি, ভাষা, জীবনদৃষ্টি একই সুরে বাঁধা। সুতরাং রোমান্টিক আর্টের সঙ্গে রোমান্টিক শিল্পকলার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

আবার ইতিহাস থেমে থাকে না, পরস্পরনির্ভরতা বা সাযুজ্যের পাশাপাশি আর একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলে। সব শিল্পই সার্থক শিল্প হয়ে ওঠে যতই সে তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। বিশেষ করে আধুনিক কালে। এই স্বতন্ত্র হওয়াই আধুনিকতা, এতটাই যে ইদানীং নাটক সাহিত্য নয় এমন দাবি উঠেছে বা মঞ্চপ্রযোজনায় নাটকের ভূমিকা গৌণ বা কোনো লিখিত টেক্সট ছাড়াই নাটক করার চেষ্টায় নতুন নাট্য আঙ্গিকের জন্ম হয়েছে। আধুনিক চিত্রকলার প্রধান নিরিখ এই যে কতটা তা সাহিত্যের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছে। প্রাক্-আধুনিক চিত্রকলা ছিল অনেকসময় সচিত্রণ বা ইলাস্ট্রেশন, ছবিতে গল্প বলায় ছিল সাহিত্যের স্বাদ, কাব্য লোকগাথা বা রাজকাহিনীর বা নানা ঘটনার স্মৃতি বা অনুষঙ্গে ছবি আঁকা হত। ছবি দেখার সব চেয়ে বড়ো আনন্দ ছিল ছবির মধ্যে কাব্যের গাথার নায়িকাকে দেখা, তাদের কাহিনীর নানা পরিচিত ঘটনার উল্লেখ খুঁজে পাওয়া। কিন্তু আধুনিক ছবিতে যাটের দশক পর্যন্ত ছবি গল্প বললে, বা কোনো কাহিনী সাহিত্যের সচিত্রণ হলে তার কলাবিশুদ্ধতা নিয়ে, তা নির্ভেজাল উচ্চমানের চিত্রকলা কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠত। চিত্রকলায় হাই মডার্নিজমের উত্তুঙ্গ চূড়া বিমূর্ত চিত্রকলা। বিমূর্ত ক্যানভাসে সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রকলার সনাতন সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হল। ফিল্ম, বিশ শতকের শিল্প, জন্মসূত্রে ছিল সাহিত্যনির্ভর, যে কারণে ফিল্মকে আমরা 'বই' বলতাম। এখন ফিল্ম স্বনির্ভর, তাই সাহিত্যনির্ভরতা থেকে তার মুক্তদশা ঘোষণা করতে ফিল্মকে বলা হয় 'ছবি'।

কিন্তু এখন আমরা যে আজ নতুন করে সাহিত্যের সঙ্গে অন্য সব সুকুমার কলার সম্পর্ক নিয়ে ভাবছি তার কারণ হয়তো এই যে, আধুনিক যুগ শেষ হয়ে অন্য আরেক যুগের সূচনা

হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যখন উচ্চমার্গীয় শিল্পের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় শিল্পের বা এক শিল্পের সঙ্গে আর এক শিল্পের ছোঁয়া বাঁচানোর দিন বদলেছে। যদিও এখনো মুখ্যত একই শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন জ্যঁর মিলেমিশে এক মিশ্র আঙ্গিক এবং মাধ্যমের শিল্পরূপ তৈরি হচ্ছে বা জনপ্রিয় জ্যঁরের আঙ্গিকে লেখা হচ্ছে সিরিয়াস উপন্যাস, সৃষ্টি হচ্ছে কনসেপচুয়াল আর্ট যাতে চারুকলার দৃশ্যময়তা গৌণ; মুখ্য, একটি প্রবন্ধের মতো বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবনার আবেদন, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সামিল হচ্ছে চারুকলা, চিত্রকলায় ব্যবহার হচ্ছে বিজ্ঞাপনের শৈলী, ভাষা বা আঙ্গিক। অনুষ্ঠেয় শিল্প এবং দৃশ্যকলা একাকার হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে পারফরম্যান্স আর্ট। আমার মনে হয় ফিল্মকে আমরা আবার 'বই' বলতে পারি যদিও একটু ভিন্ন অর্থে। এখন উত্তর-আধুনিক যুগে যে-কোনো শিল্পের বিচারে শিল্পকৃতিকে আমরা যখন টেক্সট হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তার নিজস্ব ভাষার পাঠে মগ্ন হতে পারি, তখন একটি ফিল্মকে বই বলতে বাধা কোথায়?

এ তো গেল সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্কে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ডায়াক্রনিক বা কালানুক্রমিক বিবরণ। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক অনেক বিস্তৃত জটিল এবং বিচিত্র। কিছু কিছু সূত্র ওপরে দেওয়া কালানুক্রমিক বিবরণের দৃষ্টান্তেই পাওয়া যাবে, যেমন এক এক যুগের সাহিত্য ও চারুকলা একই যুগধর্মে প্রাণিত বলে ভাবনায় বিষয়ে শৈলীতে আঙ্গিকে সে যুগের কাব্যে এবং চিত্রকলায় আমরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আবিষ্কার করি, এক যুগের কবিতা বুঝতে সে-যুগের ছবির দিকে তাকাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা আর রবি বর্মার ছবি যে একই যুগের ফসল তা আমাদের চিনতে ভুল হয় না। পশ্চিমি আধুনিকতার প্রথম অভিঘাতে দু-জনেরই সৃষ্টিপ্রেরণায় ছিল পরিশীলিত নগরমনস্কতা, যুক্তিবাদী মনন এবং প্রখর জীবন-বাস্তবতার চেতনা। রবি বর্মা নিয়েছিলেন পশ্চিমি অ্যাকাডেমিক কলারীতির বাস্তবতা, আর বঙ্কিমের উপন্যাসে পশ্চিমি উপন্যাসের বাস্তবতাবাদী শৈলীর সার্থক দেশজ রূপান্তর ঘটেছিল। মহাকাব্যের, পুরাণের দেবদেবীকে রবি বর্মা আধুনিক ভারতবর্ষের মাটিতে ত্রিমাত্রিক বাস্তবতায় রক্তমাংসের চেহারা দিয়েছিলেন। বঙ্কিম তা করেননি, সমকালের এবং অদূর অতীতের নরনারীকে তিনি সমকালীন বাস্তবতার নিরিখে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন। বঙ্কিমের সময়কে মনে রেখে যদি তাঁর উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন করা হয়, তবে তা রবি বর্মার ছবির মতই হবে। বা বলা যায় বঙ্কিম যদি ছবি আঁকতেন তা রবি বর্মার ছবির মতোই হত। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে সূর্যমুখীর শোবার ঘরের ছবিগুলি রবি বর্মার আঁকা বললে খুব ভুল হবে না। কারণ, যে 'দেশি চিত্রকর ছবিগুলি লিখিয়াছিল ভাল' সে একজন সাহেব চিত্রকরের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিল। 'ছবিগুলি লিখিয়াছিল', বঙ্কিমের এই ছবি-লেখা বা অনেক পরে অবনীন্দ্রনাথের *বুড়ো আংলা*-য় 'কোন ঠাকুর? ওবিন ঠাকুর, ছবি লেখে' আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ছবির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কে একটা নাড়ির যোগ ছিল এক সময়। পত্রলেখার লেখনী দিয়েই হত চিত্রলেখা, 'আলেখ্য' তাই ছবি। জাপানে চিনে ছবি আঁকার তুলি ছিল কবিতা লেখার লেখনী। মিশরের হায়ারোগ্লিফিক বা তুলিতে আঁকা চিনা জাপানি অক্ষরমালা, আদতে চিত্রাক্ষর বা চিত্রমালা। কিন্তু তুলি কলমের ভিন্ন ভিন্ন সংসার হওয়ার পরেও চিত্রকলা এবং সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ থেকে গেল এক অতি সাধারণ সূত্রে। একজন তুর্কী উপন্যাসের একটি চরিত্রের উক্তিতে

এই যোগসূত্রটি খুব সহজ ভাষায় চিহ্নিত হয়েছে :

> Poetry and painting, words and colour, these things are brothers to each other...

অর্থাৎ সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্কসূত্র হল ছবি। মনে করার কারণ নেই এটা এমন কিছু নতুন কথা। এই সম্পর্কের জোরালো ঘোষণা প্রাচীনকালে থেকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পরনির্ভরতার সময় থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার সময় পর্যন্ত। প্রাচীন গ্রিক কবি সাইমোনেদিস, পরে পিকাসো এবং আমাদের অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একই ভাষায় চিত্রকলা ও কাব্যকলার মধ্যে চারিত্রিক ও প্রকরণগত সাধর্ম্য লক্ষ করেছেন। সাইমোনেদিস (আধুনিক ৬৪০ খ্রি.পূ.) মনে করতেন ছবি হল 'নির্বাক কবিতা', আর কবিতা হল 'সবাক ছবি'। পিকাসো বলেছিলেন, 'শব্দ দিয়ে লেখা যায় ছবি, যেমন করে কবিতায় আঁকা যায় অনুভব।' 'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে যে বাক্য', অবনীন্দ্রনাথের মতে তা 'উচ্চারিত ছবি।' সেই রকম বাক্য বা ছবি তিনি লিখেছিলেন *বুড়ো আংলা*-য়। আত্মজীবনীর সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে।

স্মৃতিপটের আঁকিয়ে কে আমরাও জানি না কিন্তু *জীবনস্মৃতি*-র লেখক এবং সাধারণভাবে কবির কাজও যে জীবনের ছবি আঁকা এবং একই কাজ শিল্পী করেন এবং তাঁরাও কেউ 'যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাই নকল করিবার জন্য বসিয়া নাই', এমন একটা ধারণার খুব বেশি নড়চড় হয়নি অ্যারিস্টোটল থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত। দৃষ্টিগ্রাহ্যতা চিত্রকলার প্রধান শর্ত। ভাষানির্ভর শিল্পেরও কি শর্ত তাই? কবিতার সারাৎসার তীব্র দৃশ্যময়তা—The essence of poetry is visual acuity—এই মত ইংরেজ কবি রর্বাট গ্রেভসের। কবি এবং শিল্পী দু-জনেই দৃশ্য এবং দৃশ্যের অতিরিক্ত কিছু দেখেন এবং যা তাঁরা দেখেন তা যদি দেখানো না যায় তা হলে সৃষ্টি নিরর্থক হয়ে পড়ে। আবার যা দেখার নয়, যা বিমূর্ত তাকে যেমন ছবির বিষয় করেছেন কান্দিনিস্কি, অনেক কাল আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাকেই নজরবন্দী করতে চেয়েছিলেন তাঁর একটি কবিতার স্মরণীয় লাইনে—We see into the life of things—কেবল রূপ নয়, অরূপকে দেখার শক্তি এবং অরূপকে রূপের ভাষায় দৃশ্যমান করা যে-কোনো শিল্পকৃতির কাজ, মাধ্যম রং রেখাই হোক বা ভাষা শব্দই হোক। 'চতুরঙ্গ'-এর শচীশ বলেছিল, 'তিনি রূপ ভালবাসেন তাই রূপের দিকে আসিতেছেন।' যে-কোনো স্রষ্টাই রূপ ভালবাসেন, তাই শিল্পী রূপদক্ষ, তেমনি কবিকেও ভাষার গাঁথুনিতে গড়ে তুলতে হয় বাক্‌প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, 'শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি।'

কিন্তু বাক্‌প্রতিমা বা বাক্যের গাঁথুনি মাত্রেই কি ছবি? ছবি মাত্রেই তা যেমন দৃশ্যময়, সাহিত্য বা কাব্যকলা কি তেমনই দৃশ্যকলা? কবিতা কি উপন্যাস কেবলই চিত্রময়? বর্ণনায়, চিত্রকল্পে, উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় শব্দের ছবি থাকেই, কিন্তু কবি কখনো কি অনুচ্চ গাঢ় স্বরে

এমন কথা বলেন না যাতে থাকে কোনো উপলব্ধ সত্যের বা ঘন অনুভবের নিশ্চিত্র ব্যঞ্জনা? কবি কি বলেন না :

'বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি'
'A thing of beauty is a joy forever'
'স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে'
'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত'
'সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয়,'

খুব সংকীর্ণ অর্থে চিত্রপটের সর্বাংশে ছবি থাকে না—এমন কথা বলা যায়, যদি ছবি বলতে আমরা মূর্ত সাদৃশ্যধর্মী অবয়ব বুঝি। মূর্ত অবয়বের চারপাশের জমিতে থাকে ব্যঞ্জনায় ভরা রেখা, রং ও টেক্সচারের বিমূর্ত কাজ। অলডাস হাক্সলি, যাঁর বিমূর্ত চিত্রকলায় অরুচি ছিল, এমন অবিমিশ্র বিমূর্ত অভিঘাত খুঁজে পেয়েছেন—না, কোনো আধুনিক ছবিতে নয়—পনেরো শতকের ইতালিয় শিল্পী পিয়েরো দেল্লা ফ্রানচেসকা এবং কজিমো তুরার ছবিতে। তাঁর ধারণা ওই ওল্ড মাস্টারদের ছবির বিমূর্ত অংশে ধরা আছে প্রথমজনের কঠিন প্রশান্ত বুদ্ধিশাসিত নিরাসক্ত তন্ময়তা, আর অপরজনের অশান্ত যন্ত্রণাদীর্ণ মেজাজ! কিন্তু এই ধরনের অংশগুলি ছবিতে যদি বিমূর্ত বলে ধরেওনি, কবিতার উদ্ধৃত লাইনগুলিও কি ছবিহীন বিমূর্ত? ছবির মতোই কবিতার অংশ সমগ্র কবিতার সঙ্গে অন্বিত হয়ে ব্যঞ্জনার পূর্ণতা দেয় ঠিকই, কিন্তু কবিতার এই চরণগুলির কবিতার বাইরেও এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কবিকে বা উৎস কবিতাটি না জেনেও অনেক সময় কবিতার একটি বাক্যে আমাদের মন আলোড়িত হতে পারে। কারণ, ব্যঞ্জনার অনিঃশেষ আবেগময়তা, যার উৎস শব্দের অনন্য নির্বাচন ও বিন্যাস, যা আবেগে মননে স্মৃতিতে এমন কিছু ঘটাতে পারে যাতে আমরা কোনো ছবির অনুষঙ্গ পেতেও পারি। 'আমি যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?' বা 'আমার বাঁচা-মরা তোমারই হাতে, স্মরণ রেখো বন্ধুকে'—ছবির সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন শব্দগুচ্ছ আমাদের স্মৃতির অ্যালবাম থেকে একটি ভুলে-যাওয়া ছবি তুলে আনতে পারে। অবশ্য এর অন্য এক কারণও আছে। সাহিত্যের বা কাব্যের ভাষা এবং চিত্রকলার ভাষা—এবং যে-কোনো শিল্পের ভাষাই বিন্যাসের গুণে সাধারণ ভাষা থাকে না, হয়ে যায়—ফরম্যালিস্টরা যাকে বলেন meta language; সাধারণ সংবাদের ভাষা কবিতায় অর্জন করে ভাষার অতীত কোনো ব্যঞ্জনা। একটি সাধারণ আপেল সেজানের ছবিতে আর আপেল থাকে না, 'আজ বসন্ত' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় নিছক একটি ঋতুর সংবাদ দেয় না। আমরা যদি বলি শব্দের বিন্যাসে কবিতায় জন্ম নেয় সঙ্গীত, 'মনের রহস্য পায় রাগিনীর সন্ধান', তাতেও আপত্তি নেই। কারণ, কবিতা ও চিত্রকলার যে সঙ্গীতে উত্তরণের প্রবণতা আছে সে-সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন অনেক আগেই পেটার, মালার্মে এবং কন্দিনিস্কি এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু বহুকাল ধরে সঙ্গীতের চেয়ে সাহিত্য ও শিল্পকলাকে পাশাপাশি রেখে দেখার অভ্যাস আমরা অর্জন করেছি, যে-হেতু কাব্য ও চিত্রকলায় থাকবে জীবনের ছবি এমন ধারণা বহুদিনের এবং স্বতঃসিদ্ধ। এমনকী সে ছবি কত নিখুঁত বাস্তব বা স্বাভাবিক করে আঁকা যায়, কি

সাহিত্যে, কি চিত্রকলায়, তা নিয়ে স্টাইল ও টেকনিকের নানা বিবর্তন হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে। পাশাপাশি সঙ্গীতের কাছে জীবনবাস্তবতার ছবি কেউ দাবি করেননি। তাই কাব্য সাহিত্যের আলোচনায় এমন পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে যা ছবির অনুষঙ্গে লালিত এবং চিত্রকলার আলোচনায় সমানভাবে প্রযোজ্য। রুশ ফরম্যালিস্টদের গুরু রোমান জ্যাকবসন কাব্যের শব্দ-গাঁথুনি প্রসঙ্গে, সঙ্গীতের নয়, ছবিরা কথাই উল্লেখ করেছেন :

> Poetry deals with problems of verbal structure, just as the analysis of painting is concerned with pictorial structure.

প্রতিমা, চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীক, প্রতিকৃতি, রং, রেখা ইত্যাদি শব্দ, বহু ব্যবহারে জীর্ণ হলেও, আজও অপরিহার্য কি সাহিত্যের, কি শিল্পকলা বিচারে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যের পথে'-র অনেক প্রবন্ধে সাহিত্য ও কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রায় অনিবার্যভাবে এসেছে 'সাহিত্য ও চিত্রকলা', 'কবিতা ও আর্ট', 'কবি ও রূপদক্ষ', 'কবি ও রূপকার' এই সব শব্দজোড়। কথাশিল্পীকে চিত্রশিল্পী হিসেবে দেখার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কাব্য ও চিত্রকলার চিরন্তন ঘনিষ্ঠতায় চিহ্নিত ডস্টয়েভ্‌সকি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তি :

> তাঁর গঠনশক্তি দুর্বল, রেখা ও ঘনতার বিতরণ তিনি বুঝতেন না—চিত্রকল্প হলে বলা যেত তিনি অঙ্কনবিদ্যায় অপটু, বর্ণলেপনে প্রতিভাবান।

চিত্রকলার তুলনায় কাব্যকলা অর্বাচীন হলেও কবিতার সঙ্গে ছবির সহযোগ অনেক দিনের, একথা আগেই বলেছি। এই সহযোগ ভিতরের এবং বাইরের। ধ্রুপদী কাল থেকে ছবির বিষয়বস্তুর জোগান দিয়েছে কাব্য ও সাহিত্য। ইউরোপে গত শতক পর্যন্ত অনেক ছবি আঁকা হয়েছে—টিশিয়ন থেকে শুরু করে রুবেন্স, রেমব্রান্ট, দাভিদ; প্রি-রাফালাইট কবি-শিল্পীরা পর্যন্ত—যেগুলি সিংহভাগের বিষয়-আশয় মহাকাব্য, পুরাণ, বাইবেল, কখনো কখনো ইতিহাস। এই সব ছবির রচনা, শৈলী, রেখা ও রঙের চরিত্র ও জমির বিভাজন নিয়ে বিমূর্ত নান্দনিক আলোচনা করা গেলেও তাদের বিষয়গৌরব উপেক্ষা করা যায় না। বিষয়ের জন্যে বৌদ্ধজাতক, পুরাণের কাছে ঋণী আমাদের অজন্তা, সাঁচী, ভারহুত, মহাবলীপুরমের এবং বিগত কয়েক শতকের মিনিয়েচার চিত্রকলা। উনিশ শতকের শেষে, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মলগ্নে, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবি বর্মাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যে-সাহিত্যে যে চিত্রসম্পদ আছে তা আমাদের নতুন চিত্রকলার উপজীব্য হোক, নব্য ভারতীয় চিত্রকলায় পুনর্জন্ম হোক প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের, তাঁর এই প্রত্যাশাপূরণের সূচনা হয়েছিল রবি বর্মার ছবিতে। পরের দশক থেকেই কলারুচির পরিবর্তনে রবি বর্মা বাতিল হলেন, কিন্তু সদ্যোজাত নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা বা ভারতশিল্প তথা ভারতের অতীত গৌরবের প্রতিমা নির্মাণে—বিষয়ে এবং শৈলীতে—কাব্য-পুরাণ আর অতীত ভারতীয় শিল্পকলার আশ্রয়ে লালিত হতে থাকল। ক্রমশ সাহিত্য-কাব্য নয় প্রত্যক্ষ জীবন থেকে, প্রকৃতি থেকে, ছবির বিষয় এল। আঠারো শতকের ওলন্দাজ শিল্পীরা সমকালীন জীবন ও নিসর্গ প্রকৃতি এঁকেছেন। (উনিশ শতকের রোমান্টিক ও বাস্তববাদী শিল্পীরা উপেক্ষিত দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র এঁকেছেন, সাধারণকে অসাধারণ, তুচ্ছকে মহিমান্বিত করেছেন ছবিতে। সাম্প্রতিক কোনো ঘটনাকে প্রবল নাটকীয়

অভিঘাতে চিত্রিত করেছেন। এসবের দৃষ্টান্ত জেরিকো, কুরবে, দেলাক্রোয়া, দ্যোমিয়ার এবং আরো অনেকে।) আবার আধুনিকতার সূচনা থেকে ছবি যতই বিষয়মুক্ত হল বা সাহিত্য-কাব্য নির্ভরতা বর্জন করল ততই ফর্ম ও মাধ্যমকে আশ্রয় করে বিষয়ী হয়ে উঠলেন বিষয়। সাহিত্যের সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হল বটে কিন্তু এক সূক্ষ্ম আত্মিক সম্পর্কে চিত্রকলা ও কবিত্ব ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করল। কারণ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কবিতা ও শিল্পকলায় একই সঙ্গে পালাবদল শুরু হয়।

বোদলেয়র ভেরলেন র‍্যাঁবো মালার্মে প্রমুখ কবিদের কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, যা-কিছু-কবিতা-নয়, তাকে বর্জন করে শুচিস্নাত হল। দেলাক্রোয়া এবং বোদলেয়র একই সঙ্গে দৃশ্যময় জগতের মধ্যে খুঁজে পেলেন 'প্রতীকের অরণ্য'। পরবর্তীকালে বোদলেয়রের কবিতাকে ছবির ভাষায় সৃষ্টি করে নিয়েছেন রঁদ্যা, রুয়ো, মাতিসের মতো শিল্পীরা। দেগাকে মালার্মে যখন বলেছিলেন, 'কবিতা তৈরি হয় শব্দ দিয়ে, আইডিয়া দিয়ে নয়' তার কয়েক বছরের মধ্যেই শিল্পী মরিস ডেনিস বলবেন, 'পটের বর্ণলিপ্ত সমতল জমিই হল ছবি।' আর কিছু পরে একজন জার্মান শিল্পী দাবি করবেন, 'গরুর কাজ গরুর জন্ম দেওয়া, শিল্পীর নয়।' অর্থাৎ শিল্পী যে গরু আঁকবেন তাকে গরুর মতোই দেখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মালার্মের আর একটি উক্তি—Paint not the thing, but the effect it produces—কেবল কবিতার নয়, চিত্রকলারও নতুন আদর্শ সূচিত করল।

র‍্যাঁবোর কবিতা থেকে জন্ম নিল কবিতায় এবং পরে ছবিতে পরাবাস্তবতাবাদ। আরো পরে পাউল ক্লে র‍্যাঁবোসুলভ প্রেরণা পেলেন যার উৎস গুহায় উৎকীর্ণ আদিম মানুষের জাদুকরি আঁকিবুকি এবং শিশু ও উন্মাদের আত্মপ্রকাশে অচেতন স্বাচ্ছন্দ্য। এরই বিপ্রতীপে জার্মান শিল্পী জর্জ গ্রোস আঁকলেন বুর্জোয়াদের অর্থগৃধ্নুতাকে কশাঘাত করে সমাজসচেতন ছবি, যার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে ব্রেখটের প্রথম জীবনের লিরিক কবিতায়।

এদেশে কবি-শিল্পীর যুগ্মযাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে জোড়াসাঁকোয়। সৃষ্টির যে পরিমণ্ডলে সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছিল গান, নাটক, কবিতা; তারই মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ভারতশিল্পের আন্দোলন। এ-ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা'-র ছবি, গগনেন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছিলেন *জীবনস্মৃতি*, পরে এঁকেছিলেন *রক্তকরবী*-র মলাট। তিরিশের দশকের শেষ থেকে শুরু হবে যামিনী রায়ের সঙ্গে কবি বিষ্ণু দে-র বিমুগ্ধ সখ্য—পরে মর্যাদা পাবে আর এক শিল্পী-কবি জুটির—পিকাসো এবং অ্যাপোলিন্যের।

চল্লিশের দশকে এই যুগ্মচারিতা জোরদার হয়েছিল নানা বিপর্যয়ের মধ্যে—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশবিভাগ। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বয়স্ক-তরুণ কবি ও শিল্পীরা। এই সময়ের খুব পরিচিত নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিন, সোমনাথ হোড়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, যাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ছিল বামপন্থী মতাদর্শের সূত্রে।

পঞ্চাশের দশকের শেষে যে চারজন যুবক মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করত তাদের মধ্যে শিল্পী ছিলেন না কেউই। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিল বিশ্বাস, প্রকাশ

কর্মকার, বিজন চৌধুরী, রবীন মণ্ডল এবং আরো অনেকে একসঙ্গে চলাফেরা করতেন। একবার কবিকুলের সঙ্গে শিল্পীদের হাতাহাতির পর্যায়ে তুমল ঝগড়াও হয়েছিল, যা সুনীলের ভাষ্যে মদমত্ত কোলাহল। সাহিত্যে-শিল্পে কোনো নতুন আন্দোলনের বা আদর্শের তাগিদে এই সময়ের কবি-শিল্পীরা পারস্পরিক বন্ধুতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা নয়। বোধহয় অ্যাপোলিন্যের-পিকাসো-এলুয়ারের দৃষ্টান্ত কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে। তাই এই বন্ধুতার তেমন কোনো প্রবল অভিঘাত ঘটেনি এই কবিদের কবিতায় বা শিল্পীদের ছবিতে, যাতে সেই সময়ের ছবি এবং কবিতায় একযোগে কোনো নতুন আন্দোলন দেখতে পাব আমরা। কেবল নীরদ মজুমদার এবং প্রকাশ কর্মকার ছবি এঁকেছেন সুনীল ও শক্তির কবিতার সঙ্গে। সেইরকম কবিতা ও ছবির সহযোগের উল্লেখযোগ্য ফসল *সুন্দর রহস্যময়* এবং *নীলিমা ও নৈরাজ্য*।

ষাটের দশকের শিল্পীদের কদাচ দেখা গেছে কবিদের সঙ্গে। এমনকী পঞ্চাশের দশকের কবি শিল্পীরা যখন জমায়েত হয়েছেন মুক্ত মেলায় তখন সেখানে তরুণ বিকাশ ভট্টাচার্য বা গণেশ পাইনকে কেউ দেখেননি। কিন্তু ষাট, বিশেষ করে সত্তরের দশকে সৃষ্টি হয়েছে এমন অনেক কবিতায় এবং ছবিতে সমান্তরালভাবে ছায়া ফেলেছে সেই সময়ের ক্ষয়িষ্ণু প্রত্যয়ের নিষ্করুণ নৈরাজ্য।

সেই সঙ্গে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে
রক্তবৃষ্টি, অশরীরী প্রেতের গর্জন, হত্যা, আর্তনাদ;
সেই সঙ্গে একলক্ষ বলির পশু রক্তের ভিতরে স্থির হতে না হতেই
দেখা গেল একজনেরও হৃৎপিণ্ড নেই

'জুলিয়াস সীজার': মনে রেখে
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

...একটা নয় দুটো নয় তিন তিনটে রূপোলি
গোলক ঝকঝক করছে ঢালু আকাশে
তার নিশ্বাস যতদূর পৌঁছয় ততদূর টলে পড়ছে মানুষ।

বিকেলবেলা
শঙ্খ ঘোষ

এই ধরনের কবিতার পাশাপাশি রেখে দেখা চলে সোমনাথ হোড়ের *ক্ষত*, নিখিল বিশ্বাসের *ক্রুশবিদ্ধ যীশু*, প্রকাশ কর্মকারের *প্রমত্ত ঘোড়া*, গণেশ পাইনের *বন্দর* বা *ঘাতক*, বিকাশ ভট্টাচার্যের *আমার শহর* বা *পুতুল* সিরিজের ছবি। কবিতার জন্মলগ্নে ছবি বা শিল্পীর প্রেরণার উৎসে কবিতা এমন দৃষ্টান্তের তালিকা দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্রিতা*, ওয়ার্ডসওয়ার্থের *Nature and the Poet*, কীটসের *Ode to the Grecian Urn*, অডেনের *Musée de Beaux Art* অনেকের মনে পড়বে। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন, মার্ক শাগালের ১৯২২ সালে আঁকা *বাবার সমাধি* ছবিটি দেখার কয়েকদিন পরে তাঁর কলমে চলে আসে নিটোল একটি কবিতা, যার নাম 'শেখভের সমাধির মতো'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে গেছে বনে' ছিল বিকাশের আঁকা নকশালী রক্তক্ষরণে বিদীর্ণ কলকাতার অনেক দৃশ্যের

প্রেরণা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অপমান ও নীরাকে উত্তর' কবিতাটি মনে রেখে তিনি এঁকেছিলেন তাঁর *সে* বা *নারী* সিরিজের অনেক ছবি। কলা সমালোচক মৃণাল ঘোষ তাঁর *গণেশ পাইনের ছবি* গ্রন্থে জানিয়েছেন, কেমন করে শিল্পীকে অন্তঃস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল শক্তির 'আমি স্বেচ্ছাচারী' কবিতার একটি স্তবক, মহাজাতি সদনে কবিকণ্ঠে আবৃত্তি শুনে। 'তীরে কি প্রচণ্ড কলরব/জলে ভেসে যায় কার শব/ কোথা ছিল বাড়ি/রাতের কল্লোল শুধু বলে যায় / আমি স্বেচ্ছাচারী।' এই একটি স্তবক থেকে গণেশ পাইনের অসংখ্য ছবিতে এসেছে একটি নৌকার প্রতীকী রূপভাবনা।

কবিতা-প্রসূত ছবি বা ছবি-প্রণোদিত কবিতায় বীজের সঙ্গে বনস্পতির অনেক সময় কোনো সম্পর্ক থাকে না। তবু কয়েকটি বিখ্যাত দৃষ্টান্তে উৎস ছবির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক খুব ক্ষীণ নয়। কীটসের কবিতায় যে গ্রিসিয় ছবির উল্লেখ আছে—যদিও তা কোনো একটি নির্দিষ্ট ছবি নয়—তার গুরুত্ব এত বেশি যে অনেকেই মনে করেন, 'সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য'। এই বিখ্যাত উক্তিটি কবির নয়, তার উৎসও কোনো ছবি। অডেনের কবিতা, Musée de Beaux Art-এ ব্রুগেলের আঁকা *The Fall of Icarus* ছবিটির এত বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে যে একজন কাব্যতাত্ত্বিক কবিতাটিকে ছবিটির স্বচ্ছ সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিজের, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের একত্রিশটি ছবি নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্রিতা*-র কবিতাগুলি এত ছবিসম্পৃক্ত যে সেগুলিকে ছবির ইলাস্ট্রেশন বলা চলে।

বিখ্যাত শিল্পীর জীবন ও কলাচর্চা নিয়ে অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে যেমন, *Lust for Life*. *The Agony and The Ecstasy*. *The Moon and Six pence*. *The Horse's Mouth* এবং আমাদের ভাষায় *দেখি নাই ফিরে*। কিন্তু এইসব উপন্যাসে ছবি বা চিত্রকলা গৌণ বিষয়, মুখ্য হল শিল্পীর জীবন, তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম, প্রবল প্যাশন, দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য, অস্থিরতা, খ্যাতি-অখ্যাতি, সাফল্য-ব্যর্থতা, তাঁর জীবনে নারী, প্রেম ইত্যাদি নিয়ে দুরন্ত নাটকীয় ঘটনাবলী। কিন্তু সাম্প্রতিককালের দুটি উপন্যাসে শিল্পী বা তাঁর জীবন নয় আখ্যানের কেন্দ্রে আছে ছবি বা চিত্রকলা। একটি ইতালিয়ান লেখক উমবের্তো একোর নতুন উপন্যাস *The Mysterious Flame of Queen Loana,* যাতে কাহিনীসূত্রে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে নানা ধরনের ছাপা ছবি—সিনেমার পোস্টার, বিজ্ঞাপন, কমিকস, কার্টুন, পণ্য-মোড়ক ইত্যাদির বিচিত্র শাদা-কালো বা বহুবর্ণ ছবি। অন্যটি *My Name is Red*. আধুনিক তুর্কি লেখক ওরহ্যান পামুক-এর। তাঁর প্রথম উপন্যাস, কতকটা একোর প্রথম উপন্যাস *The Name of the Rose*-এর মতো ক্রাইম থ্রিলার এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর মোড়কে আধুনিক কালের কাহিনী। কিন্তু এই উপন্যাসে আখ্যান, ঘটনা, চরিত্র, সবকিছুর নিয়ন্তা চিত্রকলা এবং মধ্যযুগের শেষে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং উদার মানবতাবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছবির বিষয়, তত্ত্ব ও প্রকরণের ভূমিকা প্রবল। ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলে একে কলা-ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে।

কিন্তু শিল্পীর শিল্পকর্ম থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় এক গূঢ় অর্থে প্রাণিত হতে পারেন কবি। যেমন রিল্‌কে। রিল্‌কের কবিতায় এক আশ্চর্য চিন্ময়তার সঙ্গে মিশে আছে তীব্র তন্ময়তা।

দৃষ্টান্ত তাঁর ১৯০৭-৮ সালের 'নতুন কবিতাবলী'-র সব কবিতাই। মনে পড়বে বহুপঠিত 'চিতাবাঘ'-এর সেই স্তবক।

> যখন সে ঘোরে ফেরে সংকুচিত
> এক বৃত্তে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে, গতিবিধি শান্ত, যেন
> বলিষ্ঠ নৃত্যাবর্ত, যার কেন্দ্রে পড়ে থাকে
> অসাড় তার দুর্নিবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি।
>
> অনুবাদ : লেখককৃত

রঁদ্যার ভাস্কর্যে এবং সেজানের ছবিতে রিল্‌কে লক্ষ করেছিলেন শিল্পীর সুদক্ষ তন্ময়তা বা Objectivity। এই তন্ময়তা ছিল রঁদ্যার বাটালি দিয়ে ছেনে ছেনে পাথর থেকে মূর্তি বের করে আনায়। আর সেজানের ছবিতে তিনি দেখেছিলেন—লরেন্সের মতোই—এক নতুন নিমগ্ন বাস্তবতা। সেজানের আপেল এক অখণ্ড বাস্তবসত্তার সুকঠিন নির্মিতি। অথচ এই দৃশ্যমান জগৎ, অনুভূত বস্তুবিষয়কে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অটুট রেখে বিষয়ীর এক তীব্র চিন্ময়তায় আবিষ্ট করাই ছিল রিল্‌কের *নতুন কবিতাবলী*-র অভীষ্ট অভিঘাত। রঁদ্যা নাকি রিল্‌কেকে বলেছিলেন পারীর একটি চিড়িয়াখানায় গিয়ে কোনো একটি জন্তুর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে যতক্ষণ না একটি কবিতা জন্ম নেয়। রিল্‌কে ঠিক তেমনভাবেই 'চিতাবাঘ'-এর মতো সব কবিতা লিখেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু কেমন করে এই স্থির নিবিষ্ট তাকিয়ে থাকা এক সময় শেষ হয়ে চিন্ময়তার শুরু হয় তা তিনি অনেক পরে একটি কবিতায় জানিয়েছিলেন:

> কারণ, তাকিয়ে দেখার সীমা আছে
> এবং তাকিয়ে দেখা পৃথিবীর
> ঋদ্ধ ঘটে গভীর ভালোবাসায় চোখের কাজ এখন শেষ
> এখন শুরু হোক হৃদয়ের কাজ
> তোমার চেতনায় বন্দী ছবিগুলি নিয়ে
>
> *বাঁক*
>
> অনুবাদ : লেখককৃত

শিল্পীর শিল্পকর্মে কবি বিমুগ্ধ হলেই যে তাঁর কবিতার চরিত্র শিল্পীর প্রভাবে নতুন রূপ নেবে তা নাও হতে পারে। যেমন, বিষ্ণু দে-র কবিতায় যামিনী রায়ের কোনো লক্ষণীয় উপস্থিতি আছে বলে মনে হয় না। মনে হয় না—বলার কারণ, অলোকরঞ্জন মনে করেন, 'তাঁর কবিতায় পিকাসো, যামিনী রায় যুগ্ম নিয়ন্তার ভূমিকায় অনুস্যূত।' কিন্তু পিকাসো ও যামিনী রায়কে একই সঙ্গে 'নিয়ন্তার ভূমিকায়' দেখা যাবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যামিনী রায়ের ছবিতে আছে মসৃণ সুদক্ষ সারল্য, রেখার ছন্দ ও লালিত্য, নয়নানন্দন রঙের সমতল প্রলেপ, অবয়ব ও জমির প্রতিসম মণ্ডনধর্মী বিন্যাস। সর্বোপরি এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সুষমা। আর বিষ্ণু দে-র কবিতায় পাই ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত, জটিল, ঋদ্ধ শব্দজালে ধরা কৌণিক ব্যঞ্জনা। দুরূহ দুরাচারী উল্লেখ, বিচিত্র অনুষঙ্গে বিধৃত চিত্রকল্প। কখনো পাশ্চাত্য ধ্রুপদী

সঙ্গীতের মতো ছন্দের চাল, কখনও মেজাজি, নাগরিক নৈর্ব্যক্তিকতা। এই দুইয়ের মধ্যে চট করে কোনো সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কোনো কবির কবিতা কোনো শিল্পীর ছবি মনে করিয়ে দিতে পারে—সেই কবি বা শিল্পী সমকালের না হলেও। (১৯৮৯-এ আঁকা গণেশ হালুই-এর অনেকগুলি নিসর্গদৃশ্য দেখে মনে হবে জীবনানন্দীয় সংবেদনায় সংসক্ত তাদের প্রতিটি অংশ। তেমনি ধূসর নীলাভ আবেশ, 'মেঘে-ভেজা দুপুরের' আলো বা 'মাঠে মাঠে ঝরে শিশিরের সুর'। এমন নয় যে, জীবনানন্দকে মনে রেখে গণেশ এঁকেছিলেন এই ছবিগুলি।) এর কারণ ছবি বা কবিতা থেকে আমরা অর্জন করি অন্য কোনো ছবি বা কবিতার মধ্যে অনেক কিছু দেখার অভ্যাস। এমনকী ছবি বা কবিতার আশ্লেষে দৃশ্যমান জগতের অনেক কিছু দেখতে শিখি। শেলির 'Ode to the West wind' কবিতার প্রথম স্তবকের চিত্রকল্পে অসংলগ্নতার অভিযোগ করেছিলেন সমালোচক এফ. আর. লিভিস। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে ইয়ান জ্যাক তার ইম্প্রেশনিস্ট ছবির তুলনা করেছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হয় কতগুলি এলোমেলো রঙের ছোপ, কিন্তু একটু দূর থেকে দেখলে—অসংলগ্নতার ফাঁকগুলি কল্পনায় ভরিয়ে নিয়ে—সামগ্রিকভাবে চিত্রকল্পটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পকলার বন্ধন দৃঢ় হয়েছে আরো এক ঐতিহ্যে। শিল্পীরা কবিতা লিখেছেন, কবিরা ছবি এঁকেছেন। মিকেলেঞ্জেলো এই ঐতিহ্যের সূচনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। আরো অনেকে, অনতি অতীতে ব্লেক, উগো, প্রি-রাফালাইট কবিকুল; লরেন্স, উইন্ডহ্যাম লিউইস, হেরমান হেস ইদানীং গুইন্টার গ্রাস এই ঐতিহ্যকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের দুই দীপ্যমান সংযোজন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ।

একই অঙ্গে কবি এবং শিল্পী—এই দীর্ঘ তালিকার শীর্ষে আমি রবীন্দ্রনাথকে রাখতে চাই। তাঁর এই মূল্যায়ন স্বতন্ত্রভাবে কবি বা শিল্পী হিসেবে নয়। এত সংলগ্ন অথচ ভিন্ন দুটি শিল্পমাধ্যমে একই প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের এমন স্বতন্ত্র প্রকাশ কদাচ ঘটেছে। ১৯৫৭ সালের অগস্ট মাসে UNESCO Courier-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিষয় ছিল 'লেখক যখন শিল্পী'। মলাটে ছিল রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবির প্রতিলিপি, ভিতরে ছবি সম্বন্ধে কবির নিজের লেখা ভূমিকা-প্রবন্ধ এবং সম্পাদক স্যান্ডি কফলারের একটি বিশেষ প্রবন্ধ। সূচিপত্রে কবিদের মধ্যে ছিলেন অনেকে, তাঁদের কয়েকজনের নাম আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো স্বশিক্ষিত শিল্পী, আবার ব্লেকের মতো সুশিক্ষিত শিল্পী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সব কবি লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের চিত্রকলায় তাঁদের সাহিত্য-প্রতিভার তুল্য কোনো বিশিষ্টতার পরিচয় দেননি বা তাঁদের রচনায় এবং ছবিতে তাঁদের ভাবনার বা প্রেরণার কোনো ভিন্নতা লক্ষ করা যায় না। প্রায় সব কবির চিত্রকলা তাঁদের কবিকৃতির প্রতিধ্বনি—যেমন প্রি-রাফালাইট কবি-শিল্পী রোজেটির ছবি। এর চেয়েও সুষ্ঠু নিদর্শন মিষ্টিক কল্পদৃষ্টির কবি ব্লেক। তাঁর ছবি যেন তাঁর কবিতারই ইলাস্ট্রেশন। কিন্তু তিনি কবিতায় যা করেছিলেন প্রেরণার অমোঘ স্বাচ্ছন্দ্যে, ছবিতে তাই করতে চেয়েছেন খুব সচেতন প্রয়াসে। ব্লেকের ছবি

সম্বন্ধে অলডাস হাক্সলির মূল্যায়ন মূলত সত্য :

> Much less gifted as painter than as poet, and brought up in a deplorable artistic tradition, Blake rarely produced a picture that 'comes off' to the extent of expressing what he says so perfectly in his lyrics...

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে অসামান্য এই জন্যে যে, যখন তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণা কবিতা, গানে এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় প্রবল প্রাচুর্যে সক্রিয় তখন তিনি ভিন্নতর আত্মপ্রকাশে সেই প্রেরণাকে নবীকরণ করছেন চিত্রকলায়। তাঁর ছবিতে তাঁর কবিতার পুনরাবৃত্তি হয়নি। কিন্তু কেন এই পুনরাবৃত্তি ঘটেনি? কারণ, তাঁর প্রতিভার অনন্যতা ছাড়াও অনেক উত্তর আছে। একটি উত্তর আমাদের এই আলোচনায় খুব জরুরি। ছবি ও কবিতার সাধর্ম্য সম্পর্কে যেমন, তেমনি ভিন্নতা সম্বন্ধেও কবি ক্রমশ সচেতন হয়েছিলেন। এক সময় তিনি বলেন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বাস করতেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পের আশ্রয় হোক আমাদের প্রাচীন কাব্য-পুরাণের চিত্রসম্পদ। রবীন্দ্রনাথ রবি বর্মার ছবির একটি ফোটো-অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন বলেন্দ্রনাথকে। কিন্তু *সাহিত্যের পথে*-র একটি প্রবন্ধে কৌতুক করে বলেছিলেন, 'কচুগাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই, কিন্তু বনশোভা সজ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম করা মুশকিল।' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কারণ নিম্নবর্গের গাছগাছালির গ্রামীণ প্রকৃতিকে বনজ্যোৎস্নায় প্লাবিত করেছিলেন বিভূতিভূষণ। রবীন্দ্রনাথের ওই উক্তি বীজকোষে নিহিত সত্যের মতো। কোনো সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতিতে দুই চোখে পাখির বাসা এঁকে দিলে স্যুররিয়ালিস্ট ছবি হতে পারে, বনলতা সেন হয় না। কারণ, 'পাখির নীড়'-এ যে আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা আছে, তা ওই শব্দ দুটির ছবিতে নয়, ধ্বনিতেই অনুরণিত। তাঁর ছবিতে নন্দন ভাবনার যে আধুনিকতার জন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক শিল্পীদের পুরোধা বলে জেনেছি, তার সূত্রপাত এই চিত্রকলা ও কাব্যকলার ভিন্নতার চেতনা থেকে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও যে প্রশ্ন থেকে যায়, তা হল, যে কলা আন্দোলন জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দা থেকে তিন-চার দশক ধরে সারা দেশে ছড়িয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ কি সর্বদা তার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন? সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি যখন চিত্রকলার চর্চা শুরু করছেন, ততদিনে তাঁর স্বদেশভাবনায়, ছবি সংক্রান্ত নন্দনচিন্তায় অনেক ওলটপালট ঘটে গেছে। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা এবং ভারতশিল্পের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুনিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু রবি বর্মার ছবি থেকে অবনীন্দ্রনাথ, হ্যাভেল হয়ে নন্দলালকে কলাভবনের ভার দেওয়া পর্যন্ত কয়েক দশক কি রবীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের চর্চা করেননি?

শঙ্খ ঘোষ তাঁর *কল্পনার হিস্টিরিয়া* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বের চিত্রকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে সেই পর্বে গদ্য রচনায় 'শব্দের সিম্ফনিতে গড়ে ওঠা ছবি'র। ঠিক তেমনভাবেই দেখানো যাবে ভারতশিল্পের নান্দনিক চরিত্র, রূপভাবনা, বিষয়-নির্বাচন, ভাব-ব্যঞ্জনা, রেখার ছন্দিত সুষমা, রঙের ঐশ্বর্য বা মূর্ছনা রবীন্দ্রকবিতায় বাক্যের গাঁথুনিতে রচিত ভারতশিল্পে :

> নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।
>
> (অভিসার)

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাহার নবীন গৌরকান্তি,
সৌম্যসহাস তরুণ বয়ান, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দুসমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি॥

(অভিসার)

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি...

(স্বপ্ন)

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে,
...এনেছি শুধু বীণা

(সাগরিকা)

এসব লাইন পড়তে পড়তে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের অনেক পরিচিত ছবির কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতশিল্পীদের কলাকৃতির বিমুগ্ধ প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর কবিতার চিত্রকলা। বরং দেখা যাবে, তাঁর কাব্যের ভারতশিল্প এক স্বতন্ত্র সমান্তরাল রেখায় নানা পর্বের জটিল বৈচিত্র্যে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। কারণ, ভারতশিল্পের রূপভাবনায়, নন্দনচিন্তায় তিনি একজন স্বাধীন দিগদর্শী এবং চিত্রকলার ভিন্ন বা পশ্চিমি ঐতিহ্য থেকে রূপাদর্শ আত্মীকরণে তাঁর মতাদর্শগত কোনো আপত্তি ছিল না। তাই তাঁর কবিতায় এমন ছবির অভাব নেই যা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের ভারতশিল্পের ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না :

বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শূন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায় উৎকণ্ঠিত পাখি

(বর্ষশেষ)

ঊর্মিল লাল কাঁকরে নিস্তব্ধ-তোলপাড়

(খোয়াই)

বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়

(বাঁশি)

উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

(পথের বাঁধন)

আমরা যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন সম্পূর্ণ আধুনিক নান্দনিক ভাবনায় এবং কবিতার প্রসারণ ঘটাননি ছবিতে, বিপ্রতীপভাবে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ক্রমশ সেই আধুনিকতার দিকেই এগিয়েছিলেন যা তিনি বর্জন করেছিলেন ছবিতে। *রাজকাহিনী, নালক, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল* বা *পথে বিপথে*-র অবনীন্দ্রনাথ নয়। *বুড়ো আংলা, ভূতপত্রীর দেশে, মাসী* এবং *পালাগান*-এর ওবিন ঠাকুর একজন আধুনিক শিল্পী।

প্রাক্ আধুনিক ছবিতে যে মসৃণ ফিনিশ ছিল আধুনিকতার শুরুতেই তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। তার অর্থ ছবিতে রং রেখা তুলির আঁচড়, আঁকাবাঁকা অবয়ব, অবয়বের দ্বিমাত্রিকতা, জমির অমসৃণ উপস্থাপনা ছবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল। ছবির বিষয়ে সরাসরি পৌঁছানো গেল না, বা ওই সোচ্চার উপাদানেই পাওয়া গেল ছবির অভিব্যক্তি এবং ক্রমশ তথাকথিত বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস পেল। আধুনিকতার এই প্রাথমিক লক্ষণই ক্রমশ প্রকট হতে দেখি অবনীন্দ্রনাথের 'শব্দের ঝংকারে' লেখা ছবিতে। 'শব্দের ঝংকারে'র কথা বলেছেন বিনোদবিহারী। তিনি অবনীন্দ্রনাথের লেখা-ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর আঁকা-ছবির রঙের ঝংকারের।

কিন্তু লেখা-ছবিতে এই শব্দ কেবল রং নয়, বিচিত্র-বিচ্ছুরিত ওই শব্দের সমারোহ তাঁর 'উচ্চারিত ছবি'র যে সোচ্চার উপাদান তা একই সঙ্গে রং, রেখা, আঁকিবুকি, তুলির অমসৃণ আঁচড় এবং টেক্সচার। অবনীন্দ্রনাথের পালাগান থেকে শঙ্খ ঘোষের দেওয়া অনেক উদ্ধৃতির যে-কোনো একটিতেই তার দৃষ্টান্ত মিলবে :

'খুনখুনিয়া, নুননুনিয়া বইছে বাতাস
কনকনিয়া শনশনিয়া ঝুনঝুনিয়া
চামে ওঠে চিনচিনিয়া,
ঘাম ছোটে ছুনছুনিয়া...
তুলধুনিয়া চলছে আকাশ'

শব্দের দাপট এড়িয়ে আমরা ছবিতে পৌঁছাতে পারি না। পারলেও অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথায় 'বস্তু পাইবে এতে অল্প'। এই আঁকাবাঁকা ছবিগুলি যদি চিত্রকলার ভাষায় অনুবাদ করা যেত তবে সে-ছবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মিল পাওয়া যেত না। যে-শিল্পীর ছবির কথা চট করে মনে আসে—একেবারে তুল্যমূল্য না হলেও—তিনি পাউল ক্লে। ক্লে-র নন্দনভাবনায়, আগেই বলেছি, রেখার আঁকিবুকি খেলা, শিশুর সারল্য, উন্মাদের মতো অচেতন আত্মপ্রকাশের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। বিনোদবিহারী অবনীন্দ্রনাথের শব্দ-ছবিতে দেখেছেন 'অহেতুক আনন্দ'। ঠিক তেমনই একজন কলা-ঐতিহাসিক ক্লে-র ছবিতে লক্ষ করেছেন Innocent gaiety। এবং উভয়ক্ষেত্রেই আমরা পাই অতিরিক্ত এক নির্মল প্রশান্ত কৌতুক। অন্তত সারল্য, কৌতুক আর সৃষ্টিমত্ত পাগলামি দেখেছিলেন বলেই অবনীন্দ্রনাথের লেখা-ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'পাগলামির কারুকার্য'।

ভাষায় চিত্রকল্প, চিত্র-অনুষঙ্গ

হিরণ মিত্র

প্রস্তাব

সাহিত্য ও ললিতকলা বিষয়ে, আমার ভাবনা, এই মুহূর্তে অনেকটা ব্যক্তিগত চৌহদ্দিতে অবস্থান করছে, অর্থাৎ উদাহরণ, সাহিত্য থেকে উক্তি, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র এবং ললিতকলায় তার প্রতিফলন— এই যে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়, তার থেকে আমি নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইছি। আমার ছবিভাবনা যে বিমূর্ততায় নির্ভরশীল, যে মনন সেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনোমতেই আমি বিঘ্নিত করতে চাইছি না।

আমি যে ছন্দে আছি তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমি আমার কিছু সাহিত্যপাঠকে এখানে তুলে ধরেছি, তার সঙ্গে আছে আমার সংযোজন বা সূত্র রচনা। দীর্ঘ উক্তি থেকে যতটা বিরত থাকা যায় তার চেষ্টা যেমন আছে, এই উক্তি ও সূত্র এমন এক মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করতে আগ্রহী যার মধ্যে বিবরণ আছে, চিত্রগুণ ভাষায় প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়াস আছে। সমগ্র চিত্র-অনুভূতি বা শব্দ-ধ্বনি এক চিত্র-আবহাওয়া তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ ওই সাহিত্যকর্ম, কবিতা, তাদের সুর ও আমার সংযোজনের সুর কোথাও মিলতে চেয়েছে।

মূলত রূপকল্প, চিত্রকল্প, চিত্র-অনুষঙ্গ বিষয়ে বাংলা গদ্যে, কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে এত পাঠ আছে, এত চিত্র আছে, এমন চিত্রিত তারা বহুবর্ণে, তা এতই আমাকে মোহিত করে, তার সামান্য কয়েকটি এখানে পঠিত হবে।

এই ভাবনায় আমি ভাষা ও ছবিকেই বিষয় করতে চাই। যেখানে গদ্য, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সমস্তটাই ভাষায় নির্মিত ও তার পাশাপাশি দৃশ্যভাষা ছবিকে ঘিরে আছে।

ভাষা একটা মনস্তত্ত্বের বাহক তা লিখিতই হোক অথবা দৃশ্য। আমরা ভাষা নিয়েই ভাবি। ভাষার অলংকারে, বর্ণনায়, প্রতীকে, যে আশ্চর্য ছবি ভেসে ওঠে, তা পাঠকের কল্পিত অনুষঙ্গে থেকেই যায়। এই পাঠকের মুখ লেখক জানেন না। এই অচেনা পাঠকই অন্যদিকে লেখককে নির্মাণ করে যান। যেমন দর্শক নির্মাণ করে শিল্পীকে। এই পাঠক, এই দর্শক, এক প্রক্ষিপ্ত-জন (projected self)। এরও নিজস্ব অবস্থান আছে। সত্তা আছে। ভালো লাগা মন্দ লাগা আছে।

লেখকের অভিজ্ঞতা, ভাবনা, কল্পনা, যে ভাষার বুনট তৈরি করে তাই শিল্পীর ছবিতে বর্ণনায় হোক অথবা বিমূর্ততায় অন্য কাহিনীর সঞ্চার করে। মনের জগতে এরা পরস্পরের পরিপূরক। এমন নয় আমাদের গদ্যে কবিতায় চিত্ররূপই প্রধান বা বিশেষ কোনো অভিপ্রকাশ, কাহিনী নির্মিত হতে হতে অদ্ভুত চিত্ররূপ অজান্তেই নির্মিত হয়ে যায়, তেমনই চিত্রে রূপকথা, গল্পকথার পাঠে দর্শক মোহিত হয়ে যায়।

> ক্রমে পথটার দু-ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু-দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা। ...

> সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া, তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যে-সব বন্য-পাদপ, এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব, গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়।
>
> ...চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে।
>
> —*আরণ্যক*, বিভূতিভূষণ

শুধুমাত্র অক্ষর-ভাষা যে ছবি, যে সঙ্গীত, যে নিঃস্তব্ধতার রচনা করে পাঠককে তার নিজস্ব অবস্থানে প্রোথিত করে, তা নিপুণ শিল্পীর তুলি সঞ্চালনের মতো মনোগ্রাহী, বিভূতিভূষণের আরণ্যক বার বার আমার কথায় ফিরে আসবে, হয়তো আমার প্রকৃতি-আচ্ছন্নতা আমার অস্তিত্বে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে বলেই। আমার বিমূর্ত রচনা অমনই দেওয়ালে বর্ষার ছাপ, ক্ষয়ে যাওয়া মাটি, আস্তরের রং চটে যাওয়ার মতো প্রাকৃতিক, সময়নির্মিত চিত্রই হয়তো এর উৎস। বাড়ির দেওয়ালের ক্ষয়ে যাওয়া আস্তর প্রতিবার বৎসরান্তে নতুন মাটির প্রলেপে তখন সেজে উঠত। ছোটবেলায় এই দেখা এবার আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করা যাক—

> ...আমাদের মাটির বাড়ির দেওয়ালগুলো সাঁওতাল মেয়েরা এসে নিকিয়ে দিয়ে যেত,
> ...প্রথমে নিচু হয়ে কালো কালো হাত অর্ধচন্দ্রের মতো এপাশ ওপাশ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। এক একটা গোল ঢিপির মতো চেহারা নিচ্ছে। তার উপর আবার আর একটা ঢিপি ঢেকে যাচ্ছে, এইভাবে সার সার পাহাড়ের দৃশ্য ভেসে ওঠে। শরীরটা আস্তে আস্তে সোজা হচ্ছে। উঁচু দেওয়ালের শেষ মাথায় হাত ওঠানোর জন্য তা আরো লম্বা হতে থাকে। শাদা কালোপাড় শাড়ি। কালো রোগাটে শরীর। ঘামে চকচকে। সমস্ত দেওয়ালটা এইভাবে নিকোনোর পর তখনো ভেজা থাকে আস্তর। ওরা তখন পরম যত্নে মধ্যমা দিয়ে আলপনা এঁকে দেয় সারা দেওয়াল জুড়ে। কোনো রং নেই, কিন্তু কী আশ্চর্য এক ঐশ্বর্য নিয়ে সেই ছোটোবেলাকার কারুকাজ দেওয়ালগুলো, মেটে মেটে চেহারা নিয়ে আজো সারা শরীর শীতল করে রাখে। আমার ছবির মাটি মাটি গন্ধ এখান থেকেই ভেসে আসে।
>
> —*আমার ছবি লেখা*, লেখক

ভাষা-ছবি দেখায়

আমাদের চিত্র-ইতিহাস আর ভাষা-ইতিহাস যে যার নিজের খাতে বয়ে যাওয়া বলে আপন থেকেছে। কথোপকথন, পারস্পরিক সংলাপ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বোধের পরিধিতে নিবিষ্ট থেকেছে। লেখকের ছবি-অভিজ্ঞতা বা চিত্রীর ভাষা-অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেও দুই শিল্পী দুই অবস্থানে মননকে ছুঁয়ে গেছে। কখনও কখনও সরাসরি চিত্রও উপস্থিত—

দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি। ...দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

—*আরণ্যক*, বিভূতিভূষণ

কবিতার সারা শরীর জুড়ে এমন ছবি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মিশে গেছে। কোথাও ছবিই বিষয়, ছবিই মাধ্যম, ভাষায়; আবার কোথাও ভাষা তুলির মতো অকপটে পট ভরিয়ে তোলে। বারংবার পাঠে ছবি পালটায়, রং পালটায় ও এক আশ্চর্য ভাষার কেরামতি, বিমূর্ত ছবির মতো দর্শক তার মতো যেমন ছবি দেখে, সে নতুন নতুন প্রবেশপথ আবিষ্কার করে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে তেমনি কবিতা পাঠক তার নিজের ভাণ্ডারের রং নিঃশেষিত করে প্রতিটা পাঠে।

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর;
কী করে প্রাসাদ তাকে বলি আমি?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার;
মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর;
অথবা কিসের ছবি? কিসের ছবির হাড়গোড়?
কেবল আধেক ছায়া—

—*অবরোধ*, জীবনানন্দ

এইসব পরিচিত শব্দগুলো যখন বেজে ওঠে, পরপর সাজানো হয়, যখন ছবি হয়, তখন এই গড়ে ওঠা, বেঁধে ওঠা যে রূপ, তা কতটা ছবির মতন? অথবা ছবির হাড়গোড়, অথবা আধেক ছায়া। আমার অর্ধশতাব্দী কেটে গেল, এই ছবির মতন এক বিবর্ণ ঘরে। একসময় ঘরটায় অনেক আলো ছিল, রঙিন ঘুড়ির সার দেওয়ালের নোনা ঢেকে দিত, রঙিন চাটাই মেঝের ফাটল ঢেকে রাখত, আস্তে আস্তে ঘুড়ির কাগজ মলিন হল, ফ্যাকাশে হল, চাটাই পোকা খাওয়া, আস্তাকুঁড়ে হল তাদের বাসা। সেই আস্তাকুঁড় 'ছবি'র নতুন ঘর হল, তাতে কারো বাড়ির ফেলে দেওয়া ভাঙা ফুলদানি, পুতুলের ভাঙা হাত-পা, পুরোনো কাগজ, একটা হারিয়ে যাওয়া খড়মের এক পাটি, সবুজ বোতল, একঝাঁক রঙিন চুড়ি, এরা পশরা সাজাল, ছবির ধূপধুনো দেওয়া শান্ত উত্তাপহীন অবস্থা কেমন অশান্ত হল, উদ্বেগ চেপে বসল মনে। ভয় সন্দেহ। আড়ালে লুকিয়ে পড়া, এরা আস্তে আস্তে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ছবি পালটে চলল।

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!

— *বোধ*, জীবনানন্দ

পঞ্চাশের সেই সবজে শ্যাওলাধরা দশকটাকে এত দূর থেকে দেখি যখন কাটা ফসলের খেত হেঁটে হেঁটে ফিরেছি সন্ধের আঁধারে। কেউটের কালো আঁধার আলের ধারে ধারে নিশ্বাস ফেলে। সূর্য ডুবছে। একদিন এই খেত সবুজ ফসলে দুলে যেত। একদিন আলগুলো হারিয়ে যেত ঘন শস্যের উঁচু সারিতে। আমাদের পায়ে পায়ে, পোশাকে উঠে আসত চোরকাঁটা। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ত ওরা। তখন ছবিতে ছিল নতুন ধানের গন্ধ। তারপর একদিন খেত গেল পুড়ে। সেই পুড়ে যাওয়া খেত, এক আলোছায়ায় নতুন ছবির মতো প্রান্তরে বিছিয়ে গেল। আমি পাখির ডানায় উড়ে যাই সেই ক্যানভাসের ধার ঘেঁষে। মেঘের ছায়া পাখির ছায়া উড়ে চলে সেই ধারে।

আমার চারিদিক ঘিরিয়া উঁচু মাটির পাড়, তাহার উপর দীর্ঘ দীর্ঘ কাশ ও বনঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। ঠিক আমার মাথার উপরে খানিকটা নীল আকাশ। একটা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্ণ ফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে।... সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুলগুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন-বাণী। বাতাবী লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কতক্ষণ সেখানে একমনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলা দেশের ছেলে আমি, কতকগুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে এ দৃশ্য আমার কাছে নতুন।

—*আরণ্যক*, বিভূতিভূষণ

ভাষায় রঙ ভরে ওঠে। আমাদের জলরঙের ছবিতে, গোপাল ঘোষের রঙের উৎসবে এমনই নাম-না-জানা ফুল কাগজ ঘিরে থাকত। বিভূতিভূষণ পাঠককে যে চিত্র-আবেগে ঘিরে রাখেন পাতার পর পাতায়, গোপাল ঘোষের বন্য পদচারণায় যেন সেই আবেগ চিত্রিত থেকেছে।

শ্যাম মহা উল্লাসে ফুল সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। সকালে চায়ের সময় চা মেলে না। শ্যাম ঘরে ফিরলে কত্তামশাই চেঁচিয়ে ওঠেন : কোথায় গিয়েছিলি?

—আজ খুব সুন্দর ফুল এনেছি।

শ্যাম লাল নীল হলদে কতরকম রঙের ফুল নিয়ে আসে। নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়ে যায় রঙের। আর মাঝে মাঝে আবেগের আতিশয্যে বলে ওঠে : বাবু কি সুন্দর!

রং কত্তামশাইয়ের চোখেও ধরছে না, মনেও ছাপ ফেলছে না। কেবল কতকগুলো ধারণার সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করেন মাত্র। ভাবের মাছি ভন ভন করে ঘুরে বেড়ায়। মাছির এই ভনভনানি কত্তামশাইয়ের আর ভাল লাগে না। বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফুলগুলো যখন হাতে নিয়ে আঙুলের দৃষ্টিতে দেখেন তখন তিনি মসৃণ চিক্কন কোমল ফুলের স্পর্শে আনন্দ পান। এক ফুলের সঙ্গে অন্য ফুলের আকারগত পার্থক্যে ফুলের জগৎ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্যামের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও বলে ওঠেন : কি সুন্দর! রূপে রঙে অখণ্ড বাস্তবতা কত্তামশাইয়ের হাতে এসে টুকরো হয়ে যায়—যেমন টুকরো হয়ে গিয়েছিলেন একদিন তিনি।

—*কত্তামশাই*, বিনোদবিহারী

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অন্ধ-অন্ধকার জগত এমনই উপলব্ধির রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, পাঠকের মনে। অন্ধকারের রঙ আবিষ্কৃত হয়। যিনি ঘন অন্ধকার চারপাশকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে নিজের পথ করে নিতেন। হঠাৎ অন্ধত্ব গ্রাস করার পর।

বাড়ির পিছনে সামনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ, যেন মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সবুজের প্রাচীর। সকালে দাদা যান হাসপাতাল, মা যান রান্নাঘরের দিকে, আর আমি একা বাইরে ঘুরে ঘুরে দেখি গাছ। দূরে একটা ছাতিম গাছ, ছাতার মতন পাতা মেলে উঁচু হয়ে উঠেছে অনেকখানি। এই গাছের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। অন্যান্য গাছের সঙ্গে এর আকার প্রকার পাতা কিছুই মেলে না। তাই এই গাছের প্রতি ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ।

যতদূর দেখা যায় সবই সবুজ। রৌদ্র যেমন বাড়তে থাকে, চারদিকের ঝোপ রোদের আভা লেগে হলদে হয়ে ওঠে, আর নাকে আসে তীব্র ছেঁচামূলোর গন্ধ।...ছাতিম গাছ পেরিয়ে হাঁটু পরিমাণ ঘাস ও দুর্গন্ধওয়ালা ঝোপের মধ্য দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যায় বাবলা বন এবং বনের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় ঘন পাতাওয়ালা আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, সবই দেখি, কেবল মানুষ দেখতে পাই না।

অনেকবার আমি গোদাগাড়ির দৃশ্য আঁকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনো সফল হইনি, বালক বয়সের এই যে নির্জনতার অভিজ্ঞতা, বোধহয় কোথাও কোথাও আমার ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে।

—*চিত্রকর*, বিনোদবিহারী

স্মৃতিকথায় ছবি ফিরে আসে। অন্ধত্ব আসবার পরও তিনি বলে যেতে থাকেন—

মানুষ যতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে ততই তার মনে পড়ে অতীতের কথা। অর্থাৎ স্মৃতির জগতে মানুষ খুঁজে বেড়ায় নিজেকে। আমিও সেইরকম নিজেকে খুঁজে বেড়াই।

—*চিত্রকর*, বিনোদবিহারী

ভাষা-চিত্র এই দুই অবস্থান; আমাদের জীবনের, অভিজ্ঞতার, বোধের নানা বাঁকে নিয়ে যায়। এত অজস্র লেখা আমাকে আবিষ্ট করে রাখে, আঁকতে আঁকতে লিখতে লিখতে মনে পড়ে যায় উৎপলকুমার বসুর লাইন—

অবাক শবর তুমি, ভাষা পরিত্যাগ করেছে তোমাকে।

ছবি ও ভাষার একান্ত জগৎ সমান্তরাল চলে। ব্যবহারের চতুষ্পার্শ্ব থেকে আপাত নীরবে। কিন্তু সমস্ত জীবনীশক্তি সঞ্চিত রেখে এরা আমাদের ভিতর থেকে চালায়। বাইরের বিশ্বচরাচরে এর উপস্থিতি প্রায় টের পাওয়া যায় না। প্রদর্শনীকক্ষে, বইয়ের পাতায়, পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া অংশে, ছবিতে, ভাস্কর্যে এদের দেখা মেলে না। এরা সৃষ্টির অদ্ভুত এক পর্বে কবিতার, গদ্যের আশ্চর্য লাইনের মতো নীরবে থাকে—

অদ্ভুত রেখাগুলো কাগজে আঁচড় কেটে যায়, কখনও মসৃণ কখনও কর্কশ, তাতে তাদের দেহে কোনো হেলদোল নেই। তারা টান টান কাগজ আঁকড়ে থাকার মতো জনপদ ছাড়িয়ে নিভৃতে থেকে যেতেই থাকে। মাঝে মাঝে শুকনো মড় মড় আওয়াজ তোলে। আবার থেমে যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ রেখাগুলো শুধু তাকিয়ে।

তাই অক্ষরও কখনো ঘুমোয় না

বেলা শেষের পড়ন্ত আলো, নদীপাড়ের অপার আলো ও আকাশ, তারি রঙের ভারে টলমল, জল তারি রঙে ছল্‌ছল্‌। বেনুবণ তারি রঙে হিল্‌মিলি, বাতাস সেই রঙে ঝিল্‌মিলি।

বাদল মেঘ তাকে এসে ঢাকে; মন ফেরে তখন বাড়ি;—কুস্‌মি রঙে রাঙানো মন!

হাটের মাঝে লাগে মেলা—জ্বলে রঙ্‌মশাল—সবুজ, সোনালি, লাল নীল! মন বোঝে—তারা কেউ বলে, আমি রাতকে দিন করি; কেউ বলে পুরোনো পৃথিবীকে নতুন, সবুজে-সবুজ; নব যৌবনে তাজা করে তুলি!

তুবড়ি, ফুলে-ফুলে-ফুলন্ত সন্ধ্যাযুঁথির দিকে আগুনের কুলকুচি দিয়ে কি যে বলে, মন তা মনে-মনে বুঝে হাসতে হাসতে ঘরে আসে।

ঘরের কোণে ছোট্ট দেল্‌কোয় মাটির পিদুম, মন তার দিকে চেয়ে ভাবে ঘরের লোকের কথা; ভাবে যুগযুগান্তরের মানুষ কে সে এই আলোটুকুকে ঘরের মধ্যে বরণ করে এনে চিরকালের জন্যে ঘর আলো-করার কাজে রেখে চলে গেল।

—*আলোকশিখা*, অবনঠাকুর

অক্ষর অপেক্ষায় থাকে পাঠক এসে কখন তার মনে হাত রাখে। সে ছবি হয়ে ছায়া ফ্যালে।

তবু এবার একবার সে চেষ্টা করল, ছোট টিনের ল্যাম্পের মধ্যে তেল ছিল বা। ছোট একটু আলো হল, তখন সে ছোট ঘরটার চারিদিকে চাইল, অন্ধকার নেই, আবছায়া হয়েছিল, তেকোনা হয়ে যাওয়া খড়ের ছাওয়া বহুখানে সরে গেছে; সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য;—যেমন আছে—এইভাবে যত্নসহকারে তবু সে চতুর্দিকে চেয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই এর পরপর সে বসেছিল। ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখছিল, শীর্ণ; পদদ্বয়—তাই। এবং নিজের পরনের কাপড় নড়লে-চড়লে যেমন খসে পড়বে এরূপ সে হয় রুগ্ন, সে বাহিরের দিকে চাইলে, বাহিরে ক্রমাগত অন্ধকার, যত দেখ ততই মনে হয় ভয়ঙ্কর! নোনা জলের উপর অন্ধকার ভয়ঙ্কর আর যদি ঝিল্লির শব্দ—তাও ছিল। ফতিমার বুক দুরু দুরু করে উঠল—এ জল কবে সরবে?

—*জল*, কমলকুমার মজুমদার

এইরকম নানা স্বর ভেসে ওঠে, নানা চিত্র ভেসে ওঠে।

এমনভাবেই দিন যায়। এমনভাবেই কখনো পিঁপড়ের সারির মতো খাবারের খোঁজে ক্যানভাস ধরে হেঁটে যাই। কখনো পাখির মতো ছায়া ফেলে উড়ে যাই। কখনো বেড়ালের মতো নরম থাবায় শব্দহীন হেঁটে ফিরে।

চিত্র ও ভাষা যাত্রায়।

নিউ থিয়েটার্স-এর ৭৫ তম বর্ষপূর্তি

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

মুক্তি : শুভমুক্তি ১৮.৯.৩৭ (চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে)

মুক্তি

পরিচালনা ও অভিনয়ে

প্রমথেশ বড়ুয়া

ভূমিকালিপি

চিত্রগ্রহণ	:	বিমল রায়
শব্দযন্ত্রী	:	অতুল চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত রচনা	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজয় ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত দাস
সঙ্গীতপরিচালক	:	পঙ্কজ মল্লিক
ব্যবস্থাপক	:	পি. এন. রায়
সম্পাদক	:	কালী রাহা
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	:	সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়
গল্প ও সংলাপ	:	সজনীকান্ত দাস প্রমথেশ বড়ুয়া ফণী মজুমদার

চরিত্রলিপি

প্রশান্ত	:	প্রমথেশ বড়ুয়া
চিত্রা	:	কানন দেবী
ঝর্ণা	:	মেনকা
পাহাড়ী	:	পঙ্কজ মল্লিক
সর্দার	:	অমর মল্লিক
বিপুল	:	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
মি. মল্লিক	:	শৈলেন চৌধুরী
তৎসহ	:	দেববালা, অহি সান্যাল, কনক নারায়ণ, বিভূতি চক্রবর্তী, কাশী চৌধুরী, ব্রজবাসী, লক্ষ্মী, যতীন দে, শরদেব রায়, সুকুমার, সুধীর, নবাব খাঁ সহ আরো অনেকে

পাহাড়ের কোলে সরাইখানার মালিকের নামের বানান রাখা হয়েছে 'পাহাড়ী'।
পাহাড়ের কোলে বসবাসকারী লোকজন অর্থে বানান রাখা হয়েছে 'পাহাড়ি'।

1st Sequence

প্রশান্ত একটা বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে হাতের তুলির উল্টো দিক দিয়ে তিনবার টোকা মারে। কোনো উত্তর নেই। প্রশান্ত আবার টোকা দেয়। তিনবার টোকা দেওয়ার শুরুতেই ভিতর থেকে চিত্রার গলা শোনা যায়।

চিত্রা : কে? আরে কে?

প্রশান্ত : চুপ!

চিত্রা : ও! দরজা খুলো না।

প্রশান্ত : কেন?

চিত্রা : দাঁড়াও, কাপড় ছাড়ছি।

প্রশান্ত : ও।

চিত্রা : খুলো না।

প্রশান্ত : এই খুললাম কিন্তু।

চিত্রা : খুলো না বলছি।

প্রশান্ত : এইবার খুললাম।

চিত্রা : ছিঃ! ছিঃ! তুমি কী!

প্রশান্ত : আমি পরিচয়ে স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী প্রশান্ত রায়। এম.এ., এস.এ., etc, etc আর সম্পর্কে তোমার পরমগুরু পতিদেবতা।

চিত্রা : খুব হয়েছে, চলো। আচ্ছা, লজ্জা একেবারেই নেই না?

প্রশান্ত : কোনোকালেই তো ছিল না।

চিত্রা : হ্যাঁ, সেইজন্যই তো আর্টিস্টদের সবাই ঘেন্না করে।

প্রশান্ত : কে? কে ঘেন্না করে? থাক, নিজেদের প্রশংসা তো নিজেদের করতে নেই।

চিত্রা : এসব কী?

প্রশান্ত : এগুলো? এগুলো তো বাংলায় জামাকাপড় বলে।

চিত্রা : হ্যাঁ, তা তো আমিও জানি। কিন্তু এসব পরে কি ভদ্রলোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন যাওয়া যায়!

প্রশান্ত : ও! তা আমি তো তোমার বাবার ওখানে যাচ্ছি।

চিত্রা : হ্যাঁ। আঁ! এসো, এসো।

প্রশান্ত : না। সরো, সরো, খুব হয়েছে, সরো সরো।

চিত্রা :

(গান)

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়,
পরো পরো পরো তবে॥

মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ যে বাজল পাখির রবে॥
আজ রঙ-সাগরে তুফান ওঠে মেতে ।
যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের খেতে।
সেই রাতের স্বপন ভাঙা আমার হৃদয় হোক-না রাঙা
তোমার রঙেরই গৌরবে॥

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রা : এসব কী?

প্রশান্ত : বাবাঃ। জামাকাপড়ই যদি সভ্যতার পরিচয় হয় তাহলে তো আমি একেবারে সভ্যতার কাঞ্চনজঙ্ঘা। সে যা হোক। R.S.V.P. তে জানাচ্ছি যে বিশেষ কার্যবশত আমার সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

চিত্রা : যাঃ।

প্রশান্ত : সত্যি।

চিত্রা : মানে।

প্রশান্ত : মানে, আমায় স্টুডিয়ো যেতে হবে ।

চিত্রা : কেন?

প্রশান্ত : একটা ছবি আঁকছি। নতুন আইডিয়া একটা মাথায় এসেছে।

চিত্রা : স্টুডিয়ো পরে যাবেখন। বাবা সবাইকে বলেছেন।

প্রশান্ত : না, আমায় যেতেই হবে।

চিত্রা : কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ।

প্রশান্ত : হ্যাঁ কিন্তু সব কথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা Condition থাকে। Barring accident.

চিত্রা : এটাও কী একটা accident নাকি।

প্রশান্ত : হুঁ, হুঁ, হুঁ, ভয়ানক, ভয়ানক, ভীষণ accident.

চিত্রা : তাহলে তুমি যাবে না?

প্রশান্ত : না। আমার যেতে একটু দেরি হবে।

চিত্রা : ও। বোধহয় তোমার মডেলকে কথা দিয়েছ, না!

প্রশান্ত : ও। তা এর জবাবদিহি করতে হবে নাকি।

চিত্রা : বেশ তো। ইচ্ছে না হয় জবাব দিও না।

প্রশান্ত : ইচ্ছে না থাকলেও জবাব দিচ্ছি। মডেল আসবে না। আশা করি ভবিষ্যতে এরকম প্রশ্ন আর হবে না। যাও তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবা অপেক্ষা করছেন।

2nd Sequence

চিত্রার বাবার বাড়িতে চায়ের আসর।

চিত্রার বাবা, মি. মল্লিক বিলিয়ার্ড খেলছেন। বিপুল সি. ব্যানার্জীর সঙ্গে এগিয়ে আসে।

বিপুল : মি. ব্যানার্জী।

মি. মল্লিক : ও! ভালো? বসুন।

১ম ব্যক্তি : এক্সকিউজ মি। উনি আসবেন তো?

মি. মল্লিক : হ্যাঁ।

১ম ব্যক্তি : গুড।

২য় ব্যক্তি : যাই বলুন, প্রশান্তর ছবিগুলোই এগজিবিশনের বেস্ট ছবি।

১ম ব্যক্তি : একজ্যাক্টলি, ইউ আর রাইট।

৩য় ব্যক্তি : তবে ওর আবার সব নট ফর কম্পিটিশন কিনা।

বিপুল : চাল, চাল, ভয়ংকর চালিয়াতি মশায়। স্যরি, মার্জনা। পয়সা আছে কি না, তাই প্রাইজ চান না, তাই বিনা পয়সায় ছবি এগজিবিট করেন।

৩য় ব্যক্তি : কিন্তু অপূর্ব তার সৃষ্টি। আচ্ছা মি. মল্লিক। তিনি কখন আসবেন বলেছেন।

মল্লিক : বলেছে তো তিনটেয় আসবেন। আর্টিস্ট লোক। হয়তো দু-পাঁচ মিনিট তার দেরিও হতে পারে।

বিপুল : হয়তো কেন, নিশ্চয় দেরি হবে। কাজ না থাকলেও নিজে ইচ্ছে করে দেরি করবে।

বিপুলের মা : খোকা!

বিপুল : মা।

মা : কী যা তা বকছিস। এদিকে আয়।

বিপুল মি. মল্লিককে জিজ্ঞেস করে।

বিপুল : একটা টেলিফোন করে দেখব।

মল্লিক : টেলিফোন? আচ্ছা।

৪র্থ ব্যক্তি : আচ্ছা বিপুলবাবুর প্রশান্তবাবুর ওপর এত রাগ কেন হে?

৫ম ব্যক্তি : (হাসি) জানেন না বুঝি। ওঁরা যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তবে কর্মক্ষেত্রে নয়। প্রেমে প্রেমে।
আমায় আবার পাঁচটার সময় যেতে হবে। মেয়রের ওখানে ডিনার আছে। তৈরি হয়ে নিতে হবে তো। আচ্ছা পাঁচটার সময় উনি নিশ্চয় আসবেন।

মল্লিক : হ্যাঁ, আসবে বৈকি। এক্ষুনি আসবে।

বিপুল দৌড়ে এসে মি. মল্লিককে প্রায় ধাক্কা মারে।

মল্লিক : আচ্ছা ভগবান মানুষকে চোখদুটো কেন দিয়েছেন বলতে পারো?

বিপুল : মার্জনা। সে এসেছে কিন্তু এ আসেনি।

মল্লিক : কে এসেছে? কে আসেনি?

বিপুল : আজ্ঞে, প্রশান্ত আর চিত্রা।

মল্লিক : সে আমি জানি, কিন্তু কে এসেছে আর আসেনি কে ?

বিপুল : এই যে বললুম। উনি এসেছেন, উনি।

চিত্রার প্রবেশ। এগিয়ে এসে একজনকে প্রণাম করে।

মল্লিক : কই! প্রশান্ত কোথায়?

চিত্রা : ওর আসতে একটু দেরি হবে বাবা।

মল্লিক : দেরি? হুঁ! আমি জানি ও আসবে না। বয়! বয়! বয়! চা নিয়ে আয়।

৩য় ব্যক্তি : একটু অপেক্ষা করলে হত না।

চিত্রা : আসুন না। ততক্ষণ চা টা আরম্ভ করা যাক। উনি এসে পড়বেনখন। যা, চা নিয়ে আয়।

(Cut to)

প্রশান্তর স্টুডিয়ো। প্রশান্ত সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ক্যানভাসে ছবি আঁকছে।

(Cut to)

চিত্রার বাবার চায়ের আসর।

মি. মল্লিক : যত্ত সব ছেলেমানুষি কাণ্ড। ছবি, ছবি, ছবি আঁকেন। শিল্পী, আর্টিস্ট। শিল্পের পূজারি। একটা কথার ঠিক নেই যার। যাক, খুব শিক্ষা হল আজ আমার।

চিত্রা : একটা বিশেষ কাজ ছিল বলেই তো—

মল্লিক : বিশেষ কাজ! কী বিশেষ কাজ আর থাকতে পারে শুনি। পাঁচটা রং গুলে ছেলেখেলা করা, এর নাম যদি বিশেষ কাজ হয়; আমাদের তো আর বেঁচে থাকা চলে না বাপু। বুঝতুম আমার মতো একটা মস্ত বিজনেস চালাচ্ছে,—হ্যাঁ প্রত্যেকটা মিনিটের আমার দাম আছে।

বিপুল : নিশ্চয়ই। পাঁচটা লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি। আপনার সময়ের দাম—দাঁড়ান, দাঁড়ান এক সেকেণ্ড। ধরুন প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে, প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজারকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করে আবার যদি ষাট দিয়ে ভাগ করা যায়।

মল্লিক : চুপ করো। আমি—আমি—

বিপুল : পাঁচটা লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি—পাঁচটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেসার্স এস মালিক অ্যান্ড কোম্পানি—

মল্লিক : চুপ করো না। কী বাজে বকছ। আমি কি বলছিলাম—

বিপুল : দাম আছে।

মল্লিক : কীসের দাম আছে।

বিপুল : সময়ের।

মল্লিক : কার সময়ের?

বিপুল : আপনার।

মল্লিক : কী পাগলের মতো বকছ। ও, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার সময়ের দাম আছে। প্রত্যেকটা মিনিটের দাম আছে। নিশ্চয়ই আছে। যদি—, যদি আসতেই সে পারবে না, কথা দেয় কেন?

চিত্রা : তোমরা মিথ্যে রাগ করছ বাবা। আর তোমরাই বা সব জেনেশুনে তাকে ডাকতে যাও কেন?

মল্লিক : কে বলে আমি ডাকতে চেয়েছি। আমার বন্ধুরা সব বাইরে থেকে এসেছে। তারা সব ওকে দেখতে চেয়েছিল। সেইজন্যই তো—

বিপুল : এটিকেট জানে না।

মল্লিক : এটিকেট ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবু লোকের চোখে তো আমার মেয়ের স্বামী।

বিপুল : নিদারুণ সত্য। সৌভাগ্য।

মল্লিক : কার?

বিপুল : আজ্ঞে তার।

মল্লিক : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ওর জন্য আমার বন্ধুসমাজে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে। আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকত, কী কাণ্ড হত বলো তো।

বিপুল : সত্যি! অপূর্ব মস্তিষ্কের বিরাট নীতিহীনতার একটা বিশাল ঐরাবত। অনুর্বর মস্তিষ্কের একটা বিশাল অট্টহাসি।

বিপুলের মা : আহাঃ! যা হবার তা তো হয়েইছে।

চিত্রা : বাবা, আমার স্বামী নীতিজ্ঞানহীন, অপদার্থ, অসভ্য, বর্বর, সবই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সেটা ঘটা করে আমাকে শোনাবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। সে যাই হোক, আমার স্বামীর তরফ থেকে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তোমরা সব মহৎ প্রাণ। নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবে।

চিত্রা বেরিয়ে যায়।

বিপুল : আহা, হা-হা-হা, কী মহান হৃদয়। কী মহৎ ভঙ্গিমা।

মল্লিক : কার?

বিপুল : আজ্ঞে চিত্রার। কবি গাহিয়াছেন—

মল্লিক : চুপ করো। চুপ করো। খালি কথা, কথা। লম্বা, লম্বা কথা। জমিদারির টাকা হপ্তায় ঘরে আসে। বসে বসে খাও আর সাহিত্য করো। কোনো কর্মের নয়। আচ্ছা একটা মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি করাতে পারো না, তোমরা কী হে? যাও যাও বাড়ি যাও। সেইখেনে গিয়ে বসে বসে কবিতা—তোমার ওই কবিতা লিখো গে।

বিপুলের মা : দেখেছেন তো আপনার অন্যায় মি. মল্লিক। আমার খোকার কি দোষ? চিত্রাকে হারিয়ে ও কী আর ওতে আছে। মনের দুঃখে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। আয় সোনা, আয় বাড়ি যাই।

চিত্রার বাবা একাকী পায়চারি করতে করতে বয়দের ডাকে।

3rd Sequence

স্টুডিয়ো। চিত্রা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। প্রশান্ত ছবি আঁকছে। দরজায় করাঘাত শোনা যায়।

প্রশান্ত : কে?

চিত্রা : আমি।

প্রশান্ত দরজা খোলে। চিত্রা ঘরে ঢোকে।

প্রশান্ত : আমার বড়ো দেরি হয়ে গেল তাই আজ গিয়ে উঠতে পারলাম না। এই দ্যাখো না, ছবিটা প্রায় শেষ করে এনেছি। আজ রাতে একটু খাটলেই শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমার বাবা খুব রাগ করেছেন তো । আমি কিন্তু সত্যিই ভুলে গেছলাম। হঠাৎ দেখলাম ৭টা বেজে গেছে। তাই আর গেলাম না। কেমন লাগছে ছবিটা।

চিত্রা : ভালো।

প্রশান্ত : হুঁ। আর এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছবিটাকে বেশ রিলিফ দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর এই দ্যাখো হাতের এই কাজটা। (কয়েক মুহূর্ত চিত্রার দিকে তাকিয়ে) কী হয়েছে চিত্রা?

চিত্রা : না, নতুন কিছু নয়।

প্রশান্ত : সত্যি চিত্রা, বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে. আমার জন্য তোমার বাবার কাছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে, না?

চিত্রা : সে তো চিরকালই শুনে আসছি।

প্রশান্ত : তুমি তো সবই জানো চিত্রা।

চিত্রা : জানি, সবই জানি, সবই বুঝি। কষ্ট তো সে জন্য নয়। লোকে কথা শোনায় যে! মডেলের কথা, ছাইভস্ম আরো কত কী!

প্রশান্ত : কিন্তু তুমি তো আমায় সন্দেহ করো না?

চিত্রা : আমি হয়তো করি না, কিন্তু লোকে তো করে। তোমাকে নিয়ে পাঁচ জনের আলোচনা হয়। তারা তোমার নিন্দে করে। আমার শুনতে ভালো লাগে না। দুঃখ হয়, লজ্জা করে।

প্রশান্ত : তারা আমার প্রশংসা করে।

চিত্রা : কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। আমি চাই তারা আমার স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে। ভালোবাসবে। দূর থেকে তোমার প্রতিভা দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। কিন্তু কাছে আসতে ভয় পায়। পাছে তাদের পাখায় তোমার আগুনের ছোঁয়াচ লাগে।

প্রশান্ত : ভুলে যাও এদের কথা। তুমি আর আমি, এই নিয়েই তো আমাদের সংসার, চিত্রা।

চিত্রা : না, আমি মেয়ে। সমাজকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে? তার চেয়ে তুমি একটু বাইরে এসো। আর পাঁচজনের মাঝখানে তোমাকে আমায় সম্পূর্ণভাবে পেতে দাও।

(গান)

সুন্দর, তুমি নহ শুধু অন্তরে—
মনের গহনে তোমার মুরতিখানি।
ভেঙে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে বারে
বাহির-বিশ্বে তাইতো তোমারে টানি।
ওই যে হোথায় আকাশের নীলে
বনের সবুজ এক হয়ে মিলে
ওই যে হোথায় সাগরবেলায়
ঢেউ করে কানাকানি!
তোমার আসন পাতিব পথের ধারে,
তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে,
আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়—
বিরহে মিলনে চিরদিন জানাজানি।

— সজনীকান্ত দাস

4th sequence

মি. মল্লিকের অফিস।

বিপুল সজোরে মল্লিকের ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়।

মল্লিক : এর মানে কী?

বিপুল : আমি এসেছি।

মল্লিক : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন? কেন এসেছ? কে তোমায় আসতে বলেছে? আমি এখন কাজ করছি।

বিপুল : আমি অপমানিত হয়ে এসেছি।

মল্লিক : হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। অ্যাঁ।

বিপুল : আপনার জামাই আমায় অপমান করেছে। আমি পিকনিকে কেন? কী দোষ আছে তার ক্ষেত্রে? তা ছাড়া মেয়েদের সামনে আমি নিজেই যেতে চাই না। কেন? পিকনিকে না গেলে কি চলে না? তা ছাড়া অমিতা হাসবে। চিত্রা হাসবে। হতে পারে সে একজন বড়ো আর্টিস্ট। কিন্তু আমারও বাবার জমিদারি আছে। তা ছাড়া গণ্ডারের চামড়া মোটা, মানে কি তা আমিও বুঝি। আমাকে, আমাকে ফুটবল বলেছে জানেন, ফুটবল।

মল্লিক : তুমি চুপ করবে কি না?

বিপুল : কেন চুপ করব? চিত্রার স্বামী বলে কি আমাকে দশজনের সামনে অপমান করবে নাকি?

মল্লিক : দশজনের সামনে?

বিপুল : আজ্ঞে হ্যাঁ। দশজনের সামনে।

মল্লিক : অপমান।

বিপুল : আজ্ঞে হ্যাঁ। দশজনের সামনে একেবারে বিধ্বস্ত করে।

মল্লিক : ও।

বিপুল : আমি এর প্রতিকার চাই।

মল্লিক : সেটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

বিপুল : আপনাকে টেলিফোন করতে হবে। এক্ষুনি, আমার অনুরোধ। আমার সবিশেষ সনির্বন্ধ অনুরোধ। এর জন্য আপনার কাছে, আমি নতজানু হয়ে...

মল্লিক : দাঁড়াও। প্রশান্ত কি তোমায় বলেছে বলে তুমি আমায় বলছ, আমি তা চিত্রাকে বলি, সে প্রশান্তকে বলে যে প্রশান্ত তোমায় যা বলে সে যেন আর কক্ষনোও না বলে। কেমন? এই তো?

বিপুল : আজ্ঞে, আজ্ঞে, না...না...না।

মল্লিক : বা তাহলে তুমি আমাকে যা বলছ, আমি যেন চিত্রাকে না বলি, আর সে যেন প্রশান্তকে না বলে যা প্রশান্ত তোমাকে বলেছে সে যেন আর না বলে।

বিপুল : হ্যাঁ...কিন্তু...

মল্লিক : তবে তুমিই বলো। তুমি যে আমাকে বললে যে আমি চিত্রাকে বলি যেন সে প্রশান্তকে বলে। তাহলে আমি বলি না।

উদ্‌ভ্রান্ত বিপুল এক গ্লাস জল খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দারোয়ানকে মি. মল্লিক ভেবে বলে—

বিপুল : দেখুন, আপনি যদি...(এবার দ্রুত মল্লিকের ঘরে ঢুকে বলে—) দেখুন, আপনি যদি টেলিফোন...

মল্লিক : টেলিফোন করলে যাবে?

বিপুল : হ্যাঁ যাব। কিন্তু কেন যাব?

মল্লিক : হ্যালো, ৫৪১৫। যাবে এই জন্যে...হ্যালো, চিত্রা...আমার সময়ের একটা দাম আছে...সেই যে তোমার হিসেব মতন ৫০০০ কে ২৪ দিয়ে ভাগ করে...চিত্রা...তোমার স্বামীকে ৫০০০ কে ২৪ দিয়ে ভাগ করে...চিত্রা, হ্যালো, তোমার স্বামী একটা বর্বর।

5th Sequence

প্রশান্তর বাড়ি। চিত্রা ফোন করছে স্টুডিয়োর দারোয়ানকে।

চিত্রা : কে? ও। ছবি আঁকছেন? ও। আর কেউ আছে? ও। না, না, থাক। আর শোন, আমি টেলিফোন করেছিলাম এ কথা বলিস না যেন।

6th Sequence

স্টুডিয়ো। প্রশান্ত ছবি আঁকছে।

প্রশান্ত : একটু, হ্যাঁ, একটু ঘুরে। হল না, আচ্ছা দাঁড়াও।

(Cut to)

বিপুল ও তার মা খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছে।

বিপুল : অসম্ভব। এ অসহ্য!

মা : কীরে? মাছি নাকি?

বিপুল : না মা, মাছি নয়। অপমান। সব অপমানই সহ্য হত মা, যদি জানতাম চিত্রা শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছে।

মা : আচ্ছা তোর এত কেন বল্ তো? চিত্রার তো বিয়ে হয়ে গেছে। আর তার জন্য ভেবে লাভ কি?

বিপুল : ভাবব না। বল কী মা? আমার অসীম, নির্মল, স্নেহের উৎস ... আচ্ছা মা চিত্রাও তো মানুষ, রক্তে মাংসে গড়া। আমাদের মতো তারও তো প্রাণ আছে, ব্যথায় ব্যথিয়ে ওঠে। (এবার টেবিলে রাখা খাবারের দিকে তাকিয়ে) ও! কাটলেট!

মা : তা যা বলেছিস। তার ওপর সেদিন আবার—না রে, সে কথা তোকে বলব না। তুই যা পাগলা ছেলে?

বিপুল : করেছে বুঝি কেলেংকারি? মা তোমায় বলতেই হবে।

মা : সেদিন নাকি মডেলটাকে প্রশান্ত তার গাড়িতে নিজের ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

বিপুল : মা, আমি চললুম মি. মল্লিকের বাড়িতে। এর একটা বিহিত আমাকে করতেই হবে।

7th Sequence

মি. মল্লিক বাথটাবে স্নান করছেন। এই সময়ে বিপুল ঢোকে।

বিপুল : আমি এসেছি।

মল্লিক : (ফোন তুলে) ৪৪১৫। চিত্রা? ও চিত্রা বাড়ি নেই। ও শোনো, চিত্রা বাড়ি এলে বোলো, ওর স্বামী একটা বর্বর। গেট আউট। বাড়ি যাও।

বিপুল : আপনিও আমায় অপমান করছেন?

চিত্রা ঢোকে।

চিত্রা : একী বাবা!

বাবা : এসব তো কিছুই নয়। তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমি তো যাবই। দেশের ব্রিজ আর বাড়ি ভেঙে দেশের কত মানুষ যে মারা পড়বে তার কোনো ঠিকানা নেই। তখন কী হবে?

8th Sequence

স্টুডিয়ো।

মডেল : আপনি বাড়ি যাবেন না?

প্রশান্ত : বাড়ি যাবার সময় হয়েছে নাকি?

মডেল : হুঁ! অনেক রাত হয়েছে!

প্রশান্ত : দাঁড়াও; আর একটু বাকি আছে? আর বাড়ি গিয়েই কী লাভ? গেলেই তো সেই ভণ্ডামির পালা শুরু হবে। ওদের সারা জীবনটা ওরা যা নয় তারই অভিনয়ের চেষ্টাতে কেটে গেল।

9th Sequence

মি. মল্লিকের বাড়ি।

মল্লিক : না, আমি তার কাছে যাবই।

চিত্রা : এক্ষুনি কেন?

মল্লিক : না আমি এক্ষুনি যাব।

চিত্রা : সে এখন স্টুডিয়োতে আছে। সেখানে তুমি যাবে কী করে?

মল্লিক : ও। কেন? মডেলটা আছে বুঝি ?

চিত্রা : সেজন্য নয়। কিন্তু সে তো সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

মল্লিক : তার ঘাড় দেখা করবে। দরজা বন্ধ করে মডেলের ছবি আঁকা। তোমারও যাওয়ার হুকুম নেই বুঝি।

চিত্রা : না, না, তা নয়। শুধু শুধু ডিসটার্ব করা–

মল্লিক : চলো। যাব আমি এক্ষুনি।

চিত্রা : (পোশাকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে) এই পরেই?

মল্লিক : হ্যাঁ এই পরেই। আমার ইচ্ছে হলে আমি কিছু না পরেই যাব। গাড়ি!

10th Sequence

স্টুডিয়ো। চিত্রা, চিত্রার বাবা ও বিপুল সিঁড়ি দিয়ে উঠে বন্ধ দরজায় টোকা মারে।

প্রশান্ত : কে?

মল্লিক : আমি। দরজা খোলো। দরকার আছে।

প্রশান্ত : (মডেলকে) আচ্ছা, তুমি একটু ওঘরে যাও তো।

প্রশান্ত দরজা খোলে।

প্রশান্ত : বলুন?

মল্লিক : তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

প্রশান্ত : তা, আমি এখন একটু কাজে ব্যস্ত আছি।

মল্লিক : জানি, তবে সেটা কাজ কিনা তা জানি না।

প্রশান্ত : আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। আপনারা এখন বাড়ি যান।

মল্লিক : আমার বাড়ি যাওয়া, না যাওয়া সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে উপদেশ নিতে আসিনি।

মল্লিক মডেলের জামাকাপড়গুলো দ্যাখে।

মল্লিক : কোথায় সে?

প্রশান্ত : কে?

মল্লিক : যার জামাকাপড় এখানে পড়ে রয়েছে?

প্রশান্ত : দেখুন, আমি আপনাদের সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে চাই না।

মল্লিক : তোমার কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না।

প্রশান্ত : দাঁড়ান। আপনি আমায় মাপ করবেন। আপনি এ ঘরে যেতে পারবেন না।

মল্লিক : কে বলে আমি যেতে পারব না?

প্রশান্ত : না।

মল্লিক : সরো বলছি।

প্রশান্ত : আমি অনুরোধ করছি আপনি যাবেন না।

মল্লিক মডেলের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে দেখে।

বিপুল : অশ্লীলতার অপূর্ব অধিবেশন।

মল্লিক : এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?

প্রশান্ত : তার কি কিছু প্রয়োজন আছে?

মল্লিক : নিশ্চয়ই আছে। আমার মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করে তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইতে লজ্জা করে না। রাসকেল কোথাকার?

প্রশান্ত : আপনার এ ব্যবহার একটু ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না?

মল্লিক : তাও কি তোমার কাছে শিখতে হবে?

প্রশান্ত : তবে আপনারা এখন এখান থেকে চলে যেতে পারেন। আপনারা গণ্যমান্য ব্যক্তি—বেরিয়ে যান, আপনাদের তো আর মুখে বলতে পারি না।

মল্লিক : চিত্রা!

চিত্রা : কেন বাবা যেচে অপমান হতে আসো?

মল্লিক : চলো, বিপুল!

প্রশান্ত : একটা কথা ছিল। আপনারা যে এভাবে আমার এখানে আসেন তা আমি পছন্দ করি না। আর ভবিষ্যতে আবার যদি এসে বিরক্ত করেন—

মল্লিক : সে আর তোমায় ভাবতে হবে না। তোমার এখানে আসতে আমাদের ঘৃণাবোধ হয়। চলো, চিত্রা।

চিত্রা : না।

প্রশান্ত : চিত্রা একটু পরে যাবে। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

চিত্রা : তোমার কোনো কথা শুনবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই।

ওরা চলে যায়। এবার চিত্রার গলা শোনা যায়।

চিত্রা : আমি একবার আসতে পারি?

চিত্রা ঘরে ঢুকে বলে—

চিত্রা : তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। এই তোমার আর্ট? একে তোমার আর্ট বলো?

প্রশান্ত : তুমি এই প্রশ্ন কেন করছ ?

চিত্রা : তুমি এই ধরনের ছবি আঁকো, তা আমি চাই না। আমি এখুনি মডেলের যা কিছু পাওনা আছে চুকিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে ও স্টুডিয়োয় আসতে পারবে না।

প্রশান্ত : তুমি তা করতে পারো না।

চিত্রা : কী? তুমি আমায় বাধা দেবে!

প্রশান্ত : হ্যাঁ যদি প্রয়োজন হয়।

চিত্রা : আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা মডেল এসে দাঁড়াবে? আমাকে বিয়ে করবার আগে তোমার জানানোর দরকার ছিল।

প্রশান্ত : আমায় বিয়ে করবার আগে তোমার বোঝা উচিত ছিল।

চিত্রা : তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তোমায় বেছে নিতে হবে তুমি কাকে চাও। তোমার আর্টকে না আমাকে ?

প্রশান্ত : কী ছেলেমানুষি করছ?

চিত্রা : ছেলেমানুষি নয়।

প্রশান্ত : যদি আমি উত্তর না দিই?

চিত্রা : তাহলে তোমার আমার এখানেই শেষ।

প্রশান্ত : তুমি তা পারবে?

চিত্রা : হ্যাঁ পারব। কারণ তোমার উপর আমার আর বিশ্বাস নেই।

প্রশান্ত : তুমি আমায় ভালোবাসো?

চিত্রা : সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

প্রশান্ত : ভালোবাসারও?

চিত্রা : হ্যাঁ।

প্রশান্ত : ও। চিত্রা, যখন আমাদের দুজনের মত মিলবেই না তখন তোমার যা ভালো মনে হয় তুমি তাই করো। এখন তো বাড়ি যাও।

চিত্রা : ও! আচ্ছা।

মডেল ঢোকে।

মডেল : কাল কখন আসতে হবে?

প্রশান্ত : আসতে হবে না।

মডেল : তাহলে আবার কবে আসতে হবে?

প্রশান্ত : কোনোদিনই আসতে হবে না। (টাকা দিয়ে) এই নাও। যাও।

মডেল : আপনাকে দেখে দুঃখ হয়।

প্রশান্ত : কেন?

মডেল : ভালো থেকে কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ। আপনার মতো লোক শুধু দুঃখই দিতে জানে।

প্রশান্ত : আমার মতো লোক শুধু দুঃখই দিতে জানে!

11th Sequence

প্রশান্তর শোবার ঘর।

চিত্রা : হ্যাঁ, তুমি শুধু দুঃখই দিতে জানো, আর এ দুঃখের বোঝা আমি আর বইতে পারি না। আমি যাচ্ছি।

প্রশান্ত : কোথায়?

চিত্রা : যেখানেই হোক। এ অনেক কিছুর মাঝে আমি ঘর করতে পারব না।

প্রশান্ত : কী অনেক কিছু চিত্রা?

চিত্রা : এই তুমি আর তোমার কাজ।

প্রশান্ত : আমি তোমায় যেতে দেব না চিত্রা।

চিত্রা : কেন? আমার ইচ্ছে নেই তবুও?

প্রশান্ত : হ্যাঁ। আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে। তুমি আমার স্ত্রী। তুমি আমার। আমার সুখ দুঃখই তোমার সুখ দুঃখ। আমার সংসারই তোমার সংসার। আমি ছাড়া তোমার এ সংসারে কোনো অস্তিত্বই নেই। আমি তোমাদের এই স্বাতন্ত্র্য মানি না, চিত্রা।

চিত্রা : এই তোমার ধারণা।

প্রশান্ত : হ্যাঁ। শুধু আমার নয়। যুগ যুগ ধরে স্বামী-স্ত্রীর এই সম্বন্ধই চলে আসছে।

চিত্রা : এই সভ্যতার যুগে ও কথা বলতে লজ্জা করছে না?

প্রশান্ত : না, তোমাদের পূর্বপুরুষরা দু-পাতা ইংরেজি পড়তে জানতেন না বটে কিন্তু তোমাদের মতো সংসারের খেই হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতেন না। তাছাড়া বহু অসত্যকে মানুষ কিছু কাল ধরে সত্য বলে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। তারপর তাদের সে ভুল ভেঙেও গেছে। তোমাদের এই আধুনিক সভ্যতার ভুল তেমনি একদিন ভাঙবে।

চিত্রা : তর্ক আমি করব না। তবে আমার স্বাধীনতায় বাধা দেবার অধিকার তোমার নেই। আমি যাচ্ছি।

প্রশান্ত : না। আমি তোমায় যেতে দেবো না।

চিত্রা : ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।

প্রশান্ত : চিত্রা আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিত্রা : ছেড়ে দাও।

প্রশান্ত : চিত্রা তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

চিত্রা : না, আমি যাব।

প্রশান্ত : না-না-না।

এবার চিত্রাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

চিত্রা : কতকাল আর এ অপমান সইব।

প্রশান্ত : চিত্রা! আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিত্রা : সে আমাকে নয়। আমার এই দেহটাকে। আমার মনের পানে চাও না কেন? আমি তোমার এ অত্যাচার আর সইতে পারি না। আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি তুমি আমায় যেতে দাও। মুক্তি দাও।

প্রশান্ত : মুক্তি?

চিত্রা : হ্যাঁ, সত্যি বলছি আমি চলে যেতে চাই। যা আমার সংস্কারে বাধে, সে দাসীত্বের আশায় এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। তুমি আমায় যেতে দাও।

প্রশান্ত : কোথায় যাবে? তোমার বাবার ওখানে?

চিত্রা : বাবার ওখানে? না। জানি না কোথায়? তবে এখানে আর থাকব না।

প্রশান্ত : এ সংসার তোমার। তোমারই হাতে গড়া, তুমিই এখানে থাক। আমিই চলে যাই।

12th Sequence

প্রশান্তর স্টুডিয়ো।

প্রশান্ত তার স্টুডিয়ো লণ্ডভণ্ড করে। মূর্তি ভাঙচুর করে। Fade out

Fade in

গঙ্গার ধার—সামনে একটা গাড়ি।

গাড়ির সিটের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে নেয় এক পুলিশ অফিসার। দেখা যায় চিত্রাকে লেখা প্রশান্তর চিঠি।

(Cut to)

মল্লিকের বাড়ি।

মল্লিক : চিঠিটা গাড়ির সিটের উপরেই পড়ে ছিল, না?

অফিসার : আই থিংক ইটস এ ক্লিয়ার কেস অব সুইসাইড।

মল্লিক : স্টুডিয়োর অবস্থা দেখে তো মনে হল যে ওর মাথারই ঠিক ছিল না।

অফিসার : নিশ্চয়ই আত্মহত্যা।

চিত্রা বাবার কাঁধে মাথা রাখে।

মল্লিক : চিত্রা, তোর স্বামী একটা বর্বর ছিল।

Fade out

Fade in

13th Sequence

আসামের গাঢ় পাহাড়ের জঙ্গল। একদল শ্রমিক—পুরুষ, মেয়ে কাঁধে বোঝা নিয়ে পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলে গান গাইতে গাইতে। একজন সর্দার সর্দারি করে। হাতির পিঠে প্রশান্ত। সেই পাহাড়ের নীচে এক কোণে একটি সরাইখানা। বসে আছে সরাইখানার মালিক পাহাড়ী ও তার সঙ্গিনী ঝর্ণা। একটি কুলি মেয়ে হঠাৎ পড়ে যায়। সর্দার এগিয়ে যায়।

সর্দার : পাজি বদমাস। ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাওনি। নে তোল। তোল।

সর্দার তাকে মারতে যায়। প্রশান্ত হাতির পিঠ থেকে নেমে দৌড়ে এসে বাধা দেয়।

প্রশান্ত : এই। সরে যা। ওর গায়ে হাত দিবি না।

সর্দার : এই যে! হুজুর যে! তা সকলের বেলায় আপত্তি, না এই ছুঁড়িটা। আমরা হুজুর কুলি মজুর খাটাই, আমাদের ও ছুঁড়ি বুড়ি সবই সমান। এই বাবুর সঙ্গে যাবি?

প্রশান্ত এবার সজোরে সর্দারের গালে চড় মারে।

সর্দার : তবে হুজুর এটা জংলি দেশ। এর আইনকানুনও আলাদা। আমার কুলিদের সামনে আমাকে অপমান করে—

এই পর্যন্ত বলে সে কোমর থেকে ছোরা বের করে প্রশান্তকে মারতে যায়। প্রশান্তও রিভলবার বের করে।

প্রশান্ত : খবরদার। তোমাদের জঙ্গলের দেশ । আইনকানুনও আলাদা। কী বলো?

প্রশান্ত হাতির পিঠে চড়ে চলে যায়। মাটিতে পড়ে যাওয়া চিত্রার ফটো সর্দার কুড়িয়ে নেয়। পাহাড়ী গান গায়—

কোন লগনে জনম নিলাম
এ দুনিয়ার ঘরে?
মানিক বলে চাইরে যারে
ধূলি হয়ে ঝরে—
সুখের সাথে বিবাদ আমার
হলো চিরতরে।

যে লগনে জনম আমার
আকাশে চাঁদ ছিল।
সেদিন থেকে সে-যে আমায়
আপন করে নিল।
বনের বেণু আমার কণ্ঠে—
সুর যে ঢেলে দিল।

যে লগনে জনম আমার
আকাশে চাঁদ ছিল।

আমার মনে ফুলের গন্ধ
কে যে ঢেলে দিল।
তেপান্তরের পবন আসি
পরান হরে নিল।

— অজয় ভট্টাচার্য

পাহাড়ী : ব্যাটা ভেবেছিস কী। এই তিন খাঁচা তুলো দিয়ে এক বোতল মদ। মার মার। (বলে সে একজনকে ধরে মারতে থাকে।) বরাবর পাঁচ খাঁচা তুলো দিয়ে এসেছিস, আর আজকে কিনা...

লোকটি : মারিসনি, মারিসনি। আজ্ঞে বন্দরে তুলোর দাম বেড়েছে তা...

পাহাড়ী : বন্দর—ওরে আমার বন্দরের সওদাগররে—ব্যাটা মার খাবার শখ হয়েছে না। ঝর্ণা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয় তো।

ঝর্ণা : দু-বোতল?

পাহাড়ী : হ্যাঁ দু-বোতল।

ঝর্ণা : দু-বোতল কী হবে। পাঁচটা তো খাঁচা দিয়েছে।

পাহাড়ী : জানি। যেরকম মার খেয়েছে ওর দু-বোতলে এক বোতলের নেশা হবে। যা না।

14th Sequence

জঙ্গল। প্রশান্ত তার হাতিকে খাওয়াচ্ছে। আর কথা বলছে।

প্রশান্ত : কেমন হল তো ? আবার সেই ঘর পোড়া। তবে এবার পোড়া নয়। কী বলিস? একমাত্র আশ্রয়—পাগলা ঝর্ণা তাও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বেনোজলের এতটুকুও দয়ামায়া নেই।

রাত্রি। প্রশান্ত মদ খায়। এমন সময় দূর থেকে ঝর্ণার গান শোনা যায়।

শুনেছে সাগর কিগো ঝরনাধারার ব্যাকুলতা!
নিশীথে ফুলের কানে বাতাস আনে কোন বারতা!

— সজনীকান্ত দাস

হাতিটা ডেকে উঠলে গান থেমে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে টিন পেটানোর আওয়াজ শোনা যায়। প্রশান্ত দেখে পাহাড়ী আগুন জ্বালছে আর ঝর্ণা টিন পেটাচ্ছে।

প্রশান্ত : ওরে তোকে তাড়ানোর জন্য কী আয়োজন। যাক, কাল তো ওখানেই যেতে হবে। কারণ এক নম্বর, চাই মদ। আর দু-নম্বর চাই একটা মাথা গুঁজবার আস্তানা। এই রাজা, (হাতিকে) শোন্। আমি এখন ঘুমোব। কাল আমায় ডেকে দিবি।

15th Sequence

পাহাড়ীর গান—

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে;
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে॥
ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন্ রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে॥
কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা,
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝিনা বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে॥

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাহাড়ী তখনো সুর ভাঁজছিল। প্রশান্ত ঢোকে।

প্রশান্ত : তুমি এর মালিক?

পাহাড়ী : তুমি সেই মাতাল?

প্রশান্ত : হ্যাঁ।

পাহাড়ী : তাহলে আমিও হ্যাঁ। মানে মালিক।

প্রশান্ত : থাকবার জায়গা আছে?

পাহাড়ী : হ্যাঁ, আছে। কিন্তু—

প্রশান্ত : বেশ, বেশ। হ্যাঁ দ্যাখো, বাইরে একটা হাতি আছে। তার পায়ের কাছে গোটা কয়েক জিনিসপত্র আছে। কাউকে বলো জিনিসপত্রগুলো এখানে নিয়ে আসতে। জিনিসপত্র, হাতিটা নয়।

পাহাড়ী : শোনো।

প্রশান্ত এক গানের যন্ত্র দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে—

প্রশান্ত : এটা তোমার?

পাহাড়ী : হ্যাঁ আমার।

প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে ঝর্ণার মাথায় কাপড় তুলে জিজ্ঞেস করে—

প্রশান্ত : এও তোমার?

পাহাড়ী : হ্যাঁ।

প্রশান্ত : কাল রাতে তুমিই গান গাইছিলে? বেশ বেশ। স্ত্রী?

পাহাড়ী : হতেও পারে, নাও হতে পারে। তাতে তোমার কী হে?

প্রশান্ত : আমার? কিছু না। একটু মদ হুকুম করো না ভাই।

পাহাড়ী : ঝর্ণা, বলেছি না তোকে বাইরে আসবি না। যত সব অসভ্য মাতাল...

প্রশান্ত : আরে দাঁড়াও দাঁড়াও।

(Cut to)

প্রশান্ত : আর যেখানেই থাকি না কেন তাতে কী আসে যায়।

পাহাড়ী : আরে, আরে...একী...একী...

প্রশান্ত : কী হল?

পাহাড়ী : এত ঢকঢক করে খাচ্ছ কেন? ব্যাপারটা কী?

প্রশান্ত : কিছুই না। শুধু ভুলে থাকতে চাই। মাতাল হতে চাই।

16th Sequence

চিত্রার বাড়ি। চিত্রা গান গায়—

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুনসমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥
দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ওই কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে॥

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মি. মল্লিক : এ মায়া কেন? কার জন্য চিত্রা?

চিত্রা : সব তো বেচে দিয়েছি বাবা। শুধু শেষবারের মতো দেখে যাই।

মল্লিক : তার জন্য তুই কেন কাঁদবি মা? সে তো তোর যোগ্য ছিল না।

চিত্রা : তা হবে বাবা। চলো।

(Cut to)

ঝর্ণা রান্না করছে।

প্রশান্ত : ঝর্ণা আমরাও খেতে জানি।

ঝর্ণা : হ্যাঁ, শুধু মদ। ছিঃ।

প্রশান্ত : মানে?

ঝর্ণা : কেন যে অত ছাইভস্ম খাও!

প্রশান্ত : সমাজ অসভ্য বলে এক ঘরে করে দিলে।

ঝর্ণা : কেন?

প্রশান্ত : কেন মানে কি ? এই মুখের উপর তুমি জানিয়ে ফেললে। একবারও ডাকলে না...(হাসি)...আরে এর মধ্যে হাসির কী আছে। আচ্ছা, এখন কিছু চাল আর যা হোক কিছু একটা দাও।

ঝর্ণা : কেন?

প্রশান্ত : আমাদেরও খিদে বলে একটা জিনিস আছে। কিছু এনেছ? দাও।

ঝর্ণা : ও। তা বলতে লজ্জা করল না? তুমি যে আমাদের অতিথি গো—দেবতা।

প্রশান্ত : সে আবার কে?

ঝর্ণা : তা জানো না। কীরকম হিন্দু তুমি। তুমি হিন্দু গো?

প্রশান্ত : হ্যাঁ।

ঝর্ণা : তবে তুমি নিশ্চিন্তে ও ঘরে গিয়ে ঘুমোওগে। এগুলো রাঁধছি কার জন্য। যাও। যাও।

(Cut to)

ঝর্ণা : শুনছ?

প্রশান্ত : হল না রে আজ আমার শিকারে যাওয়া। যা বেঁটা বেঁচে গেলি।

ঝর্ণা : কেমন লাগছে ?

প্রশান্ত : কী?

ঝর্ণা : কী আবার, চা? মিষ্টি হয়েছে? তুমি কেন অত মদ খাও?

প্রশান্ত : কেন তোমার আপত্তি আছে নাকি ?

ঝর্ণা : তোমাকে বেশ ভালো লাগে। আমার বেশ লাগে। এই দ্যাখো তো, এই আমার বোতামটা লাগিয়ে দেবে। দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই দ্যাখো, হাতে যা সব কালি—আর একটু হলেই দিয়েছিলে জামায় সব দাগ লাগিয়ে।

প্রশান্ত : হ্যাঁ, তারপর।

ঝর্ণা গান গায়—

মন নিয়েছে কোন বিদেশি
কইতে নারি হায়—
(ও তার) রূপের অনল লাগল চোখে
পরাণ জ্বলে তায়॥

স্রোতের ফুল সে এলো ভেসে
আমার ঘাটে ভিড়লো শেষে
সে যে আমার আমি যে তার
কে তারে বুঝায়॥

— অজয় ভট্টাচার্য।

প্রশান্ত : চাবিটা কোথায়?

প্রশান্ত : তুমি এ গান গাইলে কেন?

ঝর্ণা : বারে মন যা চায় তাই গায়।

প্রশান্ত : এর মানে জানো। আমায় এ গান শোনাবার মানে তুমি আমায় ভালোবাসো।

ঝর্ণা : মানে...

প্রশান্ত : মানে তুমি চাও যে আমি...

ঝর্ণা : হ্যাঁ গা, তোমায় ভালোবাসতে কোনো বাধা আছে?

প্রশান্ত : আছে।

ঝর্ণা : না নেই। পাহাড়ীর সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয়নি। আমি মুক্ত, আমায় কে বাধা দেবে গা?

প্রশান্ত : কে? শুধু অন্তর, আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা। বিচার নেই, বিবেচনা নেই, মস্তিষ্ক নেই। তুমি নির্বোধ।

ঝর্ণা : বলো তুমি আমায় ভালোবাসো। বলো না গা। তুমি আমায় ভালোবাসো।

প্রশান্ত : বন্ধু কোথায়?

ঝর্ণা : বাজারে গেছে। আসতে দেরি হবে।

সর্দার ঢোকে।

সর্দার : পাহাড়ী আসছে। এই যে মীনাদি, বলি এক পেয়ালা চা হবে, অ্যাঁ। (প্রশান্তকে) বাবুজি কেমন আছেন? বেশ বেশ। শরীর ভালো তো অ্যাঁ? বেশ... (হাসি)

পাহাড়ী ঢোকে, গুন গুন করে গান গেয়ে।

পাহাড়ী : (ঝর্ণাকে) এটা রাখ্। এগুলো তোল্।

সর্দার : নাঃ, মেয়েমানুষ জাতটাই খারাপ। কী বলো পাহাড়ী? এই দেখুন না, এই দেখুন। একটা মেয়ের ছবি দেখেই চোখে ঘুম নেই। বুকটা হা হা করে ওঠে। সত্যি যদি চোখে দেখতুম না জানি কী হত! কী বলেন বাবুজি! অ্যাঁ, এই দেখুন না।

প্রশান্ত ছবিটা হাতে নেয়। সর্দার বলে—

সর্দার : দেখতে বেশ অ্যাঁ।

প্রশান্ত সর্দারের মুখে ঘুসি মারে। সর্দার পাল্টা ছোরা মারতে যায়। প্রশান্ত সর্দারের হাতে গুলি করে।

প্রশান্ত : সভ্যতার বাইরে আইনকানুনের বালাই নেই। কী বলো সর্দার?

পাহাড়ী : এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। আরে আরে তুমি তো মহা সাংঘাতিক লোক দেখছি হে। ওরা তো ভয়ংকর লোক। ওদের সঙ্গে লাগতে আছে? ওরা কথায় কথায় ছোরা চালিয়ে দেয়। বাপরে, বাপরে, বাপরে, বাপ। আর হাতের কী নিশানা। একেবারে নির্ভুল। উঃ আরে তুমি তো মরেছিলে আর একটু হলে। ছোরা চালিয়ে দিলে তুমি কী আর বাঁচতে? ওদের চটিয়ো না বন্ধু, চটিয়ো না। আমি বলছি, ওদের চটিয়ো না। আহা—এটা এদিকে কেন? ওদিকে রাখো না। চলো। ওরে বাপরে বাপ।

17th Sequence

ঝর্ণা জঙ্গলে জল আনতে যাচ্ছে। গান গায়—

ওগো বন্ধু তোমারি বেদন
কাঁদে মোর অন্তরে,

তোমার চোখের জল
আমার নয়নে ঝরে।
স্মরিয়া তব নাম
প্রদীপ জ্বালি তুলসী-তলে,
যে ফুল দেছ তুমি অলকে দিনু রাখি
তোমারি স্মৃতি সে যে
জাগায় পলে পলে॥

— অজয় ভট্টাচার্য

ঝর্ণা : এখানকার জল খুব ভালো।

প্রশান্ত : আর আমাদের ওই ঘাটের জল খারাপ, না?

ঝর্ণা : ঘাটের জল তো সবাই নেয় যে।

প্রশান্ত : দ্যাখো ঝর্ণা...

ঝর্ণা : আর বলতে হবে না। তুমি বড়ো বকো। কোনো কাজের নয়।

ঝর্ণা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে চিৎকার করে ওঠে—

ঝর্ণা : মাগো, পা-টা মচকে গেল।

প্রশান্ত ছুটে এসে ঝর্ণার পা দ্যাখে।

ঝর্ণা : ওগো। তুমি আমায় তুলে নিয়ে যেতে পারবে?

প্রশান্ত : চলো। খুব লেগেছে না? তুমি একটু সাবধানে চলতে পারো না?

ঝর্ণা : আমি পারি না। কিন্তু তুমি খুব সাবধানে চলতে পারো?

প্রশান্ত ঝর্ণাকে জলের মাঝখানেই ফেলে দেয়।

18th Sequence

পাহাড়ী ও সর্দার হাঁটছে।

সর্দার : ঘি আর আগুন একসঙ্গে রাখাই খারাপ। এতকাল আমরা একসঙ্গে একদেশে কাটালুম, তোমাকে ছোটো ভাইয়ের মতো দেখি। আর আমার কী বলো? তাছাড়া দেখেছ তো, লোকটা মাতাল, বেপরোয়া। ঠাট্টা করে যে গুলি চালাতে পারে, সে কি-না করতে পারে বলো।

পাহাড়ী : উঁহু, না, না, এ হতে পারে না। সে একটা ভদ্রলোকের ছেলে।

সর্দার : আহা, আমি কি তাই বলছি। সত্যি বলতে আমার তার ওপর মোটেই রাগ নেই। সেদিন একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে বলে, তুমি কি মনে করো আমিও ছেলেমানুষি করব?

পাহাড়ী : না না, এ হতে পারে না।

সর্দার : ভগবান করুন যেন কিছু না হয়। তবে কি জানো, সেদিন তুমি বাড়ি ছিলে না, নিজের চোখে দেখলুম।

পাহাড়ী : কী দেখলে?

সর্দার : বিশেষ কিছু নয়। ঘোমটা নেই, এই হাসিঠাট্টা। এতক্ষণ দুজনে একসঙ্গে একলা বাড়িতে থাকা। এই আর কী।

19th Sequence

প্রশান্ত, ঝর্ণা।

প্রশান্ত : আচ্ছা, ওটার তখন কী হল?

ঝর্ণা : আমার খুব ভালো লাগে।

প্রশান্ত : কী, কী, কী ভালো লাগে তোমার?

ঝর্ণা : তোমার কাছে থাকতে।

প্রশান্ত : এটা দেখেছ? (ঝর্ণাকে চিত্রার ফোটোগ্রাফ দেখায়।)

ঝর্ণা : আমি এর থেকেও সুন্দরী।

প্রশান্ত : ও! খুব যে অহংকার!

ঝর্ণা : সত্যি কথা বলব তার আর ভয় কী !

প্রশান্ত : আচ্ছা ঝর্ণা, তুমি কী চাও আমি এখান থেকে চলে যাই।

ঝর্ণা : কেন গো!

প্রশান্ত : পাহাড়ী আমার বন্ধু।

ঝর্ণা : শুধু তাই।

প্রশান্ত : না। তাছাড়া আমি তোমায় ভালোবাসি না।

ঝর্ণা : তুমি আমায় ভালোবাসো না?

প্রশান্ত : না।

ঝর্ণা : তুমি আমায় কাছে পেতে চাও না?

প্রশান্ত : না, ঝর্ণা।

ঝর্ণা : সত্যি?

প্রশান্ত : সত্যি, তোমায় আমি ভালোবাসি না।

ঝর্ণা : ও। নাঃ, তুমি লোক ভালো নয়।

প্রশান্ত : এতদিনে চিনতে পারলে, না?

ঝর্ণা : হ্যাঁ, চিনেছি। তুমি মানুষকে বড়ো দুঃখ দাও।

পাহাড়ী দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রশান্ত উঠে যায়।

পাহাড়ী : তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

প্রশান্ত : জানি ভাই। চলো ও ঘরে চলো...
আমি জানি বন্ধু তুমি কী জানতে চাও। কিন্তু ভগবান সাক্ষী তুমি যা ভেবেছ তা ভুল।

পাহাড়ী : মিথ্যে কথা। নেমকহারাম তুমি। তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, তোমাকে বিশ্বাস করেছি। তোমাকে বন্ধু ভেবেছি। এই তার প্রতিদান। বন্ধুর সর্বনাশ করতে এতটুকু তোমাদের বাধে না। এই তোমাদের শিক্ষা, এই

তোমাদের সভ্যতা। মিথ্যেবাদী কোথাকার। তোমাদের সমস্ত মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।

প্রশান্ত : বন্ধু আমি কেন মিথ্যে বলব। যে আজ সবকিছুর মায়া কাটিয়ে, মরণের পারে এসে দাঁড়িয়েছে, তার মিথ্যে বলে লাভ। কী যায় আসে তার?

পাহাড়ী : কে মরতে চলেছে? এর মানে কী?

প্রশান্ত : শোনো বন্ধু, তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। তোমার বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমি ছাড়া কেউ সাক্ষী নেই। জীবনে অনেকে আমায় ভুল বুঝেছিল। কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমার ওপর এত বড়ো অবিচার কোরো না। আমি তোমার বন্ধু।

পাহাড়ী : তুমি 'বন্ধু' একথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না।

প্রশান্ত : না, না, না। তুমি আমার মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করো। বুঝতে পারবে আমি সত্যি বলছি কি না?

(গান)

তারে তুই দিসনে ব্যথা ভুল করে,
যারে তুই ভাবিস কাঁটা
তারই মাঝে ফুল ধরে।
মরণ যারে গেল ডাকি
সে কেন আজ দিবে ফাঁকি
তারে তুই কাঁদাসনে আর
আপন থেকে যার নয়নে জল ঝরে॥

— অজয় ভট্টাচার্য

Dissolve

20th Sequence.

চিত্রা বিপুল কথা বলছে।

চিত্রা : ভাবত তার মনই আমার মন। তাই নতুন করে দেখবার, তার আর প্রয়োজন হত না।

বিপুল : সে তোমায় অবহেলা করত।

চিত্রা : সে চাইত আমি যেন তাকে অবহেলা না করি।

বিপুল : তার কর্তব্য সে করেনি।

চিত্রা : সে ভাবত ভালোবাসার চেয়ে বড়ো কর্তব্য আর কিছুই নেই।

বিপুল : সে তো তোমায় মেনে চলত না চিত্রা।

চিত্রা : সে জানত সে পুরুষ আর আমি তার স্ত্রী।

বিপুল : সে তোমায় অপমান করত। তোমার গায়ে হাত তুলেছে সে।

চিত্রা : সে ভাবত সে তার নিজের গায়েই হাত তুলছে।

বিপুল : আমি অত বুঝি না। আমি শুধু এই বুঝি যে আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি দেখতে হয়তো কুৎসিত কিন্তু আমারও প্রাণ আছে, সেও ভালোবাসতে জানে। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমায় বিয়ে করবে কি না?

চিত্রা : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই করব বিপুলবাবু। আমার বিয়ে না করার যে কোনো কারণই থাকতে পারে না। আমি সুশিক্ষিতা, আধুনিক সমাজের আলোকে আমার পোশাক-আশাক সব বদলে গেছে। তার উপর, তুমি বিলেত ফেরত। পয়সা আছে। আমায় ভালোবাসো। এক্ষেত্রে, যদি আমরা বিয়ে না করি তাহলে লজ্জায় যে সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।

বিপুল : চিত্রা! চিত্রা! আমার আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমায় ভালোবাসবে।

চিত্রা : তোমার বাড়িতে পাথরের মূর্তি তো অনেক আছে। না হয় আর একটা বাড়বে!

চিত্রা : আমি ভালোবেসে সেই পাথরের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব। ও! আমি একটু বড়ো বড়ো কথা বলে ফেলছি। নাঃ, চলো, তোমার বাবার কাছে যাই।

Fade out

Fade in

21st Sequence

চিত্রা, চিত্রার বাবা, বিপুল কথা বলে।

মল্লিক : তা, তুই কী সত্যি বলছিস?

চিত্রা : তা নয়তো কী বাবা? ইউরোপের মেয়েরা, আমেরিকার মেয়েরা স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসাকে দাসীত্ব বলেছে। কুসংস্কার বলেছে। আমরা যদি তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে না পারি তাহলে প্রগতি রইল কোথায়?

মল্লিক : তুই কী বলছিস মা।

চিত্রা : ঠিকই বলছি বাবা, যা হোক, তোমরা আমাকে দুটো দিন সময় দাও।

মল্লিক : এখনও ভাবছিস?

চিত্রা : দাও না ভাবতে। দুটো দিন তো। আমি তোমাদের কাছে আবদার করছি।

বিপুল : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তোমার হৃদয়ের গোপন গভীর কোণে সেদিন সেই উদাসী সুরের তুফান উঠে...

মল্লিক : আচ্ছা মা। তাহলে তুমি এখন যাও। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আমার একটু দরকার আছে।

বিপুল : বিশদ একটু আলোচনা—। ও।

Fade out

Fade in

22nd Sequence

হাসপাতাল। চিত্রা একজন নার্সের সঙ্গে কথা বলে।

নার্স : নমস্কার।

চিত্রা : নমস্কার। আপনার কাছে আমি একটা কথা জানতে এসেছি।

নার্স : বলুন।

চিত্রা : আমার স্বামী—আপনি...

নার্স : এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কি একান্ত দরকার।

চিত্রা : হ্যাঁ, এর উপর আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, আমার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে।

নার্স : ও। তা আপনার নিজের কী মনে হয়। আপনি কী আপনার স্বামীকে বিশ্বাস করতেন না।

চিত্রা : না।

নার্স : আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন।

চিত্রা : নমস্কার।

Fade out

Fade in

23rd Sequence

রাত্রি। পাহাড়ি লোকজনেরা; পুরুষ, মেয়ে নাচগানে মত্ত।

(গান)

হেথায় কে চায় কাহারে?
বাধা পেয়ে ফেরে নয়ন দূর-পাহাড়ে—
হেথায় কে চায় কাহারে?
গাছেরা বাড়ায় শাখা আলোর পানে,—
কীসের টানে—
কখন পায় তাহারে?
কেবলি হারায় দিশা বাড়াই তৃষা
বুকের হাহা রে
আমাদের বুকের হাহা রে—
হেথায় কে চায় কাহারে?

— সজনীকান্ত দাস

আসরে সর্দার ও পাহাড়ীকে দেখা যায়। পাহাড়ী গান ধরে।

(গান)

তুমি ভুল কোরো না পথিক
শোনো শোনো মিনতি।

আশা আছে রে তোর ছেঁড়েনি ডোর
আজো হয়নি যে রে আসল ক্ষতি !
এখনো সময় আছে চপল-মতি॥
ওগো মন-ভোলানো পথিক
তুমি ছাড় পথ তোমার জগৎ
ডাক দিয়েছে থামাও গতি
এসো ঘরে এসো চপল-মতি ॥
তোর খোলা যে দ্বার হয়নি আঁধার
নেভেনি তোর দিনের জ্যোতি,
আয় ফিরে আয় চপল-মতি॥

— সজনীকান্ত দাস

প্রশান্ত বসেছিল একা। পাহাড়ী এসে পাশে বসে।
একজন লোক এসে একটা বোঁচকা এনে প্রশান্তর টেবিলে রাখে। প্রশান্ত বোঁচকার উপরে রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে দ্যাখে।

Dissolve

24th Sequence

পাহাড়ীর ঘর।
পাহাড়ী আর ঝর্ণা কথা বলে।

ঝর্ণা : খালি খেয়েই যাচ্ছে।
পাহাড়ী : যে বারণ মানতে জানে না, তাকে বারণ করে কী লাভ বল্।
প্রশান্ত ঢোকে।
পাহাড়ী : বন্ধু তোমার এসব কী হচ্ছে?
প্রশান্ত : মাতাল হতে চাই। কিন্তু ভগবান, মাতাল হই না কেন?
পাহাড়ী : হ্যাঁ দ্যাখো, তোমার হাতিটা কোথায়? তাকে তো তুমি দেখাশোনা করো না। সে যে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়...
প্রশান্ত : বেড়াক ! সে ভুলে যাক আমায়।
পাহাড়ী : ভুলতে সে কী পারে বন্ধু ?
প্রশান্ত : সে কী ভুলতে পারে? ও যে হাতি। একটা জানোয়ার। ওতো আর মানুষ নয়। সে কী করে ভুলবে বলো। ওটাকে ছেড়ে দিয়েছি। যাক। চুলোয় যাক।
পাহাড়ী : হাতিটা চলে গেছে?
প্রশান্ত : হ্যাঁ। বন্ধু। শুধু তুমিই রয়ে গেছ। চলে যেতে চাও যাও।
বাইরে হাতির ডাক শোনা যায়। প্রশান্ত বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যায়।
পাহাড়ী : আরে আরে যাচ্ছ কোথায়? কোথায় চললে?

প্রশান্ত হাতির পিঠে চড়ে চলে যায়।
প্রশান্ত : তুই এইখানেই দাঁড়া। আমি হেঁটেই যাচ্ছি। বড়ো বড়ো শিকারি কিনা। পৌঁছবার আগেই গুলি মেরে উড়িয়ে দেবে। গাধা কোথাকার। সব ভুলে গেছিস। মেরে মরতে পারলি না।
একদল শিকারী। একটা গাছের তলায় বসে খানাপিনা করছে।
১ম শিকারি : বড্ড লং রেঞ্জে মারলে।
২য় শিকারি : তা কী করব? ভাবলুম বেশি কাছে গেলে...
বিপুল : আরো কাছে? ওর কাছে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কী বলো?
২য় শিকারি : আমার গুলি লেগেছে। ওর দাঁত আমার।
৩য় শিকারি : গণ্ডার, মোষ, হাতির বেলায় লাস্ট শট যার, তার।
২য় শিকারি : না, না, তার কোনো মানে নেই।
৩য় শিকারি : নিশ্চয়ই মানে আছে বলছি।
১ম শিকারি : আহা! আগে খাও পরে সে সব কথা হবে।
৪র্থ শিকারি : বাঃ একেই তো বলে স্পোর্টিং স্পিরিট। হাতি না মরতেই দাঁত নিয়েই বন্ধুবিচ্ছেদ।
বিপুল : প্রশান্ত!
প্রশান্ত এগিয়ে আসে।
বিপুল : তুমি! তুমি তো মরে গেছ। তুমি! তুমি তাহলে মরোনি।
প্রশান্ত : এখনো না। চিত্রা কোথায়?
বিপুল : ক্যাম্পে। সে—সেও এসেছে।
প্রশান্ত : নিয়তির এ পরিহাসের কোনো প্রয়োজন ছিল কি? ছিল না।
বিপুল : শোনো প্রশান্ত! তুমি সেখানে যেতে পাবে না, তুমি যেয়ো না। সে জানে তুমি মরে গেছ। সে তোমায় কখনো চায়নি। আজও চায় না। তার বাধা হয়ে দাঁড়াবার তোমার কোনো অধিকার নেই। বলো, বলো, তুমি ওখানে যাবে না।

Fade out

Fade in

পাহাড়ী গান গায়—

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার-মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,

তাদের পানে ভাঁটার টানে যাবো রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে, দিন যে চ'লে যায়।
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়॥

অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি' হেথায় পাড়ি ধ'রবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়?
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়॥

ঘরেই যারা যাবার তা'রা কখন গেছে ঘর-পানে
পারে যারা যাবার, গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে!
ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফললো না
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বললো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

25th Sequence

রাত। শিকারিদের তাঁবু। দূর থেকে 'ওরে বাবা। ওরে বাবা' আর্ত চিৎকার শোনা যায়। মি. মল্লিকের তাঁবু। মি. মল্লিকের বুকের উপর বিপুলবাবু বসে ভয়ে কাঁপছেন। দুজন শিকারি তাঁবুর ভিতরে ঢোকে।

১ম শিকারি : আরে একী! ব্যাপার কী? কী হয়েছে মশাই। বিপুলবাবু। চোখ খুলুন। কী হয়েছে মশাই।

বিপুল : বাঘ।

১ম শিকারি : বাঘ! বাঘ কোথায়?

মল্লিক : অ্যাঁ! কে, বিপুল তুমি? নামো, নামো। নেমে যাও বলছি। ওকে নামিয়ে দাও। ওরে বাবারে আলোটা আবার নেভালে কেন? সাবধান করে ধরো না। বিপুল আমি জানতে চাই এর মানে কি? এর অর্থ কি?

বিপুল : আমি এক গ্লাস জল পেতে পারি কি?

মল্লিক : না, না, পেতে পারো না।

বিপুল : আজ্ঞে মার্জনা।

মল্লিক : খবরদার। এটা মার্জনার সময় নয়।

২য় শিকারি : কিন্তু কী হয়েছে?

বিপুল : ওই যে মসমস। মানে আওয়াজ। আমি ভেবেছিলাম তাঁবুর বাইরে বাঘ এসেছে।

১ম শিকারি : বাঘ?

২য় শিকারি : তাঁবুর বাইরে?

মল্লিক : ভেবেছিলে?

বিপুল : আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু জল।

মল্লিক : খবরদার। ভেবেছিলে বাঘ। তাই বলে একজন ভদ্রলোকের বুকের উপর চড়ে বসবে।

বিপুল : আজ্ঞে। ভেবেছিলাম একা কেন? দুজনে একসঙ্গে।

মল্লিক : দুজনে একসঙ্গে বাঘের পেটে যাই।

বিপুল : হ্যাঁ।

মল্লিক : তুমি ভেবেছ কী? জানো আমারও দমবন্ধ হয়ে প্রায় হার্টফেল করার জোগাড় হয়েছিল। আমিও ভেবেছিলুম বুঝি আমারও বুকের উপর বাঘ চড়েছে। হতভাগা, বেবুন, উজবুক।

বিপুল : আপনি আমায় গালাগাল দিচ্ছেন।

মল্লিক : নিশ্চয়ই দিচ্ছি। তুমি তোমার ওই তিন মন সাড়ে দশ সের ওজন নিয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোকের বুকের ওপর চড়ে বসে রাত দুপুরে হার্টফেল করাতে চাও। ইয়ার্কি পেয়েছ।

১ম শিকারি : আহা। যাকগে। যাকগে।

মল্লিক : কী যাকগে। যাকগে কথাটার মানে কি? অ্যাই, অ্যাই, একগ্লাস জল, জল নিয়ে আয়। অ্যাই আবার আলোটা নিয়ে যায়?

বিপুল : আমার জন্যেও।

মল্লিক : না, না, কোথায়? এই নেমে এসো, নেমে এসো, নেমে এসো বলছি। আনলি জল? জল আনলি! যা। নিয়ে আয় ওর জন্য। যাঃ। এক বালতি জল নিয়ে আয়। যা, নিয়ে আয়। কই এসো, এসো, এসো বলছি। শুয়ে পড়ো। বন্দুক ? বন্দুক কোথায়? ওই যে।
(একজনকে বন্দুকটা দিয়ে বলেন—) ধর্, ধর্ বন্দুক। বস্। বস্ এখানে। ও উঠলেই গুলি করবি। মেরে ফেলবি। রাত দুপুরে বুড়ো মানুষের বুকের উপর চড়া বের করছি ওর। হতভাগা।

বিপুল : আজ্ঞে, আমি বলেছি তো আমি আন্তরিক মার্জনাপ্রার্থী।

Fade out

Fade in

26th Sequence

(ব্যাকগ্রাউন্ডে অসমিয়া লোকসঙ্গীত শোনা যায়।) Fade out

Fade in

27th Sequence

সারি সারি শিকারের তাঁবু।

একটা তাঁবুর সামনে মল্লিক দাড়ি কামায়। বিপুল সেদিকেই আসে।

মল্লিক : আবার কি বাঘ দেখেছ নাকি ?

বিপুল : বাঘ?

মল্লিক : হ্যাঁ। বাঘ। শুনেছি লোকে বিশেষ অবস্থায় চোখে সর্ষের ফুল দেখে থাকে।

বিপুল : ও । আপনি এখনো সেকথা ভোলেননি।

মল্লিক : এখনো! সারা জীবনেও ভুলব না, নিজের প্রাণ বাঁচাতে অন্ধকারে তুমি বুড়ো লোকের বুকের উপর চড়ে বসো।

বিপুল : আমি সত্যিই লজ্জিত। ব্যথার প্রকোপে জর্জরিত।

মল্লিক : তারপর?

বিপুল : আমরা আজ যাচ্ছি হাতি শিকার করতে।

মল্লিক : পোষা হাতি ?

বিপুল : না, বুনো।

মল্লিক : অ্যাঁ, তুমি শিকার করবে হাতি?

বিপুল : অ্যাঁ, আমি যাচ্ছি দেখতে।

মল্লিক : যাও। আমি আজ আর যাচ্ছি না, আর দ্যাখো... শোনো, কলকাতা থেকে এসেছ। এদের অতিথি হয়ে । এদের কাছে মুখ দেখাবার অবস্থাটা রেখো।

বিপুল : নিশ্চয়ই। আপনার উপদেশ আমি নিশ্চয়ই মানব।

মল্লিক : তা এইটা আগে মেনে এই শিকারে না এলেই কি ভালো হত না? বারণ করলাম এত করে। তা মেয়েটাও হয়েছে তেমনি একগুঁয়ে। তুমিও তেমনি একটা ইয়ে। এই বিদেশে এসে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দুম দুম করে জানোয়ার মারবার যে কী সার্থকতা—এটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

Dissolve

28th Sequence

শিকারি : পাহাড়তলির জঙ্গলটায় আছে কিছু?

সর্দার : হ্যাঁ আছে কিছু ভারী জঙ্গল। আগুন না লাগালে তো কিছু পাবে না ভাই। আমি বলি কি হাতিটাই আগে মারো।

শিকারি : হাতি ?

সর্দার : হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাতি।

শিকারি : দাঁতাল?

সর্দার : হ্যাঁ। দাঁতাল বইকি।

29th Sequence

তাঁবুর ভিতরে চিত্রা আর তার বন্ধু ইন্দ্রাণী গল্প করে।

চিত্রা : ইন্দ্রাণী, বেরুব না। কাল এসে অবধি বড়ো টায়ার্ড ফিল করছি। একদিন রেস্ট নেব।

ইন্দ্রাণী : তাহলে আমিও যাব না। হাতি শিকারে গিয়ে লাভ কী!

এবার সর্দার চিত্রাদের তাঁবুতে ঢোকে।

সর্দার : সেলাম হুজুর। আমি এ অঞ্চলের সর্দার।

চিত্রা : ও।

সর্দার : আপনার গোলাম।

30th Sequence

হাতি শিকার।

(Cut to)

তাঁবুর ভেতরে সর্দার ও চিত্রা।

চিত্রা : আমি যাবই। আমাকে যেতেই হবে।

সর্দার : তা দেখুন। আপনার গোলাম আমি। আপনি যা হুকুম করবেন তা করতেই হবে। তা কর্তারা জানতে পারলে...

চিত্রা : কেউ জানতে পারবে না। তোমার কোনো ভয় নেই।

31st Sequence

আর একটা তাঁবুর অভ্যন্তরে মি. মল্লিক, বিপুল ও একজন শিকারি।

শিকারি : এরই মধ্যে, চলে যাবেন কেন?

মল্লিক : বিশেষ কাজ আছে। তাই আমাদের চলে যেতে হবে।

শিকারি : তা, দু-দিন থেকে শিকার করে গেলে হত না।

মল্লিক : না, না, তা কী করে হবে? কাজ রয়েছে যে, কাজ থাকলে কী আর থাকা যায়? কী বলো বিপুল।

বিপুল : না, না, না—আমাদের কালই যেতে হবে।

32nd Sequence

পাহাড়ীর ঘরে প্রশান্ত ও পাহাড়ী।

প্রশান্ত : যখন বিচারের বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন যে বলবার আর কিছুই থাকে না—আমি তোমাদের শান্তি কেড়ে নিয়েছি, না?

পাহাড়ী : কী বলছ? ওসব কথা আমার ভালো লাগে না।

এইসময় বাইরে চিৎকার শোনা যায়। 'কে আছ? কে আছ? প্রশান্ত? প্রশান্ত?' বলতে বলতে মি. মল্লিক, বিপুল ও আর একজন শিকারিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

মল্লিক : অ্যাই কোথায় সে? আমার মেয়ে? কোথায় সে? পাজি রাসকেল। ছুঁচো কোথাকার?

পাহাড়ী : আরে মশায় বলছেন কী? সে কে?

বিপুল : আহা, এ নয় । এ নয়। সে সর্দার বেটা প্রশান্তের চর। আজ গুলি মেরে মাথা উড়িয়ে দেবো। এরই সঙ্গে তো... এই যে ড্যাম সোয়াইন, চিত্রা কোথায়?

প্রশান্ত : চিত্রা? কী বলছ তুমি?

বিপুল : চোপরাও, রাসকেল, তোমার লোকটা মানে সেই সর্দার বেটা—চার ঘণ্টা হল তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বলো সে কোথায়? নইলে মেরে উড়িয়ে দেবো বলে রাখছি। বলো শিগগির।

প্রশান্ত : সর্দারের সঙ্গে চার ঘণ্টা হল...?

বিপুল : বলো শিগগির । নইলে।

প্রশান্ত : কী ছেলেমানুষি হচ্ছে? রাখো পিস্তল। সত্যি চিত্রা চার ঘণ্টা হল সর্দারের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে? সর্দার তো রাস্তা জানে। সোজা রাস্তায় আসতে এক ঘণ্টা লাগে। তবে সর্দারটা সোজা রাস্তায় চলে না।

মল্লিক : আরে কী পাগলের মতো বকছ তুমি?

প্রশান্ত : সর্দারের নজরটা চিরকালই একটু উঁচু । তবে শুধু নজরটাই। বুদ্ধি নেই কিছু। কী করে প্রতিশোধ নিতে হয় তাও জানে না। ভুল, ভুল, আমি জানি, সর্দার একটা ভুল করবেই । মস্ত ভুল করেছে সর্দার—বড়ো ভুল করেছে। বন্ধু আমি যাই। আমি যাই।

মল্লিক : এসব কী ব্যাপার?

পাহাড়ী : একটু দাঁড়ান।

পাহাড়ী : ঝর্ণা, আমি বন্ধুর পাহাড়তলিতে যাচ্ছি। যদি ফিরতে রাত হয় তাহলে...

Fade out

Fade in

ঘরের মধ্যে চিত্রা হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায়।

সর্দার : হে, হে । এই যে...অ্যাঁ...শিকার করতে এসেছিলে...নিজেই শিকার হয়ে গেলে...আচ্ছা, আচ্ছা ক-দিনে শায়েস্তা হও দেখা যাক। অ্যাঁ...চলবে।

(Cut to)

প্রশান্ত ঢোকে। ঢুকে গুলি ছোঁড়ে।

প্রশান্ত : খবরদার।

সর্দার : এবার বুঝি আমার পালা।

প্রশান্ত : হ্যাঁ। এবার তোমার পালা। এর মধ্যে আর বুঝি নেই।

সর্দার : আপনারা হুজুর সব ভদ্দরলোক । লেখাপড়া জানেন। তা ছাড়া আমার হাতে হাতিয়ার নেই। যদি মারতে চান মারুন।

প্রশান্ত চিত্রার বাঁধন খুলতে শুরু করে।

চিত্রা : তুমি ! তুমি এসেছ!

প্রশান্ত চিত্রার বাঁধন খুলতে থাকে। সর্দার ছোরা তুলে নেয়।

পাহাড়ী : বন্ধু।

চিত্রা : প্রশান্ত!

পাহাড়ী : বন্ধু।

সর্দার ছোরা ছুড়ে মারে। প্রশান্তর পিঠে গেঁথে যায়। প্রশান্ত ঘুরে গুলি ছোঁড়ে। সর্দারের বুকে গুলি লাগে। সর্দার পড়ে যায়।

পাহাড়ী : একী করলে? বন্ধু, এ যে আত্মহত্যা!

প্রশান্ত : হ্যাঁ, এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। এটাকে বার করে নাও বন্ধু।

চিত্রা : ওগো।

প্রশান্ত : বলো।

চিত্রা : এ অভিমান তুমি কার উপর করলে?

প্রশান্ত : অভিমান কার উপর করব? আমার তো কেউ ছিল না চিত্রা। তুমি মুক্তি চেয়েছিলে না...

চিত্রা : না।

প্রশান্ত : হ্যাঁ, তুমি না চাইলেও তোমার শিক্ষা চেয়েছিল, তোমার সমাজ চেয়েছিল, তোমার সংস্কার চেয়েছিল, চিত্রা।

চিরদিনের পালা,
ওরে পাগল, খাটবি কত আর
তোরা কাঁদবি কত আর?
তোদের রক্ত-রাঙা ধূলায়,
হেলায় ওরা চরণ বুলায়,
(তোদের) চোখের জলে ফোটে যে ফুল
ওদের গলায় তারই মালা।

—সজনীকান্ত দাস

সমাপ্ত

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

১৪১১

কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা

হার্ডব্যাক - ২৫০ টাকা

আঁকা ছবি

৬০টি অপ্রকাশিত বহুবর্ণ ছবি

বইয়ের রঙিন প্রচ্ছদ

প্রচ্ছদের খসড়া

কয়েকটি শাদা কালো ছবি

আলোকচিত্র

পারিবারিক অ্যালবাম (৪ বছর বয়স থেকে)

যৌবনে কমলকুমার

বন্ধু এবং ভাইবোনেদের সঙ্গে কমলকুমার

হরবোলা পর্বের ছবি

দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানরত কমলকুমার

দুর্লভ 'উষ্ণীষ' এবং 'তদন্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ

প্রবন্ধ ও গল্প

১৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ (ইতিপূর্বে গ্রন্থে অসংকলিত) ও একটি গল্প

তথ্যচিত্র

লিখিত ৩টি তথ্যচিত্রের ভাষ্যের সম্পূর্ণ পাঠ

এ-ছাড়াও কমলকুমার নির্দেশিত নাটকের প্রচারপত্র, প্রবেশপত্র, শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থের অলংকরণ সহ আরো বহু কিছু।

অঙ্কভাবনা

দুর্লভ অঙ্কবিষয়ক পত্রিকার দুটি সংখ্যার সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ।

এখনো পাওয়া যাচ্ছে

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যা

১৪১১

সীমিত সংখ্যায় এখনো পাওয়া যাচ্ছে

দাম : ৬০ টাকা

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় আমাদের স্টলে পাওয়া যাবে

১৪১২ বইমেলায় আমাদের টেবিলে পাওয়া যাবে

তিনটি চিত্রনাট্য

দেখা

শুভ মহরৎ

লালসালু

আলাদা করেও পাওয়া যাচ্ছে

দেখা : ৩৫ টাকা

শুভ মহরৎ : ৩৫ টাকা

লালসালু : ৩০ টাকা

উত্তরা : ৩০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে বিভাবের অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পুরোনো সংখ্যা

THE NEW THEATRES LIMITED

জীবতাং জ্যোতিরনু জ্বয়াম

নিউ থিয়েটার্স-এর ৭৫ তম বর্ষপূর্তি

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

উদয়ের পথে : শুভমুক্তি ১.৯.৪৪ (চিত্রা ও রূপালী প্রেক্ষাগৃহে)

উদয়ের পথে

পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ
বিমল রায়

ভূমিকালিপি

কাহিনী	জ্যোতির্ময় রায়
চিত্রনাট্য	বিমল রায়, নির্মল দে
গীতকার	শৈলেন রায়
সঙ্গীত পরিচালনা	রাইচাঁদ বড়াল
শব্দযন্ত্রী	অতুল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশক	সৌরেন সেন
চিত্র সম্পাদক	হরিদাস মহলানবীশ
রসায়নাগারিক	পঞ্চানন নন্দন
নৃত্য পরিকল্পনা	এম কে নায়ার
ব্যবস্থাপক	জলু বড়াল
দৃশ্য সংগঠনে	পুলিন ঘোষ

অভিনয়ে

রাধামোহন ভট্টাচার্য	বিনতা বসু
দেবী মুখোপাধ্যায়	রেখা মিত্র
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী	মীরা দত্ত
জীবেন বসু	লীনা বসু
তুলসী চক্রবর্তী	মায়া বসু
পুর মল্লিক	স্মৃতিরেখা বিশ্বাস
বোকেন চট্টোপাধ্যায়	দেববালা
তারাপদ চৌধুরী	রাজলক্ষ্মী

1st Sequence

কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকা। Top-angle shot. ফ্রেমের ডান কোনায় অশ্বারোহী কোনো সাহেবের মূর্তি—কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার 'পায়ের তলায়' কলকাতা শহর। ট্রাম লাইনে ট্রাম চলছে। রাস্তা দিয়ে দেখা যায় একটি শাদা গাড়ি। এবার long shot-এ (normal angle) গাড়ি অভিজাত পল্লি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গরিব পাড়ায় এসে ঢোকে ও কিছু পরে থেমে যায়। উরদিপরা ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দেয় ও দুটি তরুণী নামে। পোশাক দেখে অনুমান করা যায় যে একজন বড়োলোকের মেয়ে (দামি শাড়ি, চোখে কালো চশমা, নাম গোপা)। অন্যজন যার পরনে সাধারণ শাড়ি (নাম সুমিতা) সে বলে—

সুমিতা : এই বাড়িটার নীচের তলায় আমরা থাকি। আয়।

ওরা বাড়ির ভিতর ঢোকে।

সুমিতা : মা।

মা : (উত্তর দেন) কী রে? (বলে উঠে আসেন।)

সুমিতা : গোপা আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গেই পড়ি। ও এসেছে তোমার সাথে পরিচয় করতে আর আমাকে নেমন্তন্ন করতে।

মা-র হাতে একটা মাটির হাঁড়ি, তাড়াহুড়োতে নামিয়ে আসেননি। বলেন—

মা : তা বেশ বেশ। কীসের নেমন্তন্ন মা?

গোপা : জন্মদিনের। আমার ছোটো ভাইঝির জন্মদিন। সুমিতাকে কিন্তু যেতেই হবে। ও না গেলে ভারি দুঃখিত হব।

মা : তা যাবে বইকি। তুমি এসেছ মা, বড়ো খুশি হলুম। আমাদের মতো গরিবের ঘরে তোমাকে কোথায়ই বা বসতে দিই? তুই বরঞ্চ ওকে নিয়ে অনুপের ঘরে গিয়ে বোস্।

ওরা সুমিতার দাদা অনুপের ঘরে গিয়ে ঢুকলে প্রথমে দেখা যায় দেওয়ালে অরবিন্দের পেনসিলে আঁকা স্কেচ।

গোপা : আরে দেওয়ালময় কী কাণ্ড?

ক্যামেরা track করে। দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। তার নীচে বোতলে রাখা রজনীগন্ধা। একটা জানলার ওপরে দেয়ালটা আর্চ করা; আর আর্চের নীচে লেখা রয়েছে—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

গোপা : বার্নাড শ; বিবেকানন্দ। এসব কী?

সুমিতা : ছবি।

গোপা : ছবি তো বুঝলাম আঁকল কে?

সুমিতা : দাদা।

গোপা : ভাগ্যিস বুদ্ধি করে তলায় নামগুলো লিখে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, তোর দাদার কী মাথা খারাপ!

গোপার কথা শুনে সুমিতা গম্ভীর হয়ে যায়।

গোপা : না ভাই কিছু মনে করিস না। আমি কিছু ভেবে বলিনি।

সুমিতা : দাদা পাগল কিনা জানি না। তবে রাম শ্যাম দশজনের মতো স্বাভাবিক যে নয় সে সত্যি। ছাপানো ছবি ঘরে রাখা তিনি পছন্দ করেন না। মনীষীদের তো নয়ই। তিনি বলেন, তাতে চেহারার আদলটা থাকে, মানুষের পরিচয় কিছুই থাকে না। শিল্পীদের আঁকা ছবি কেনার ক্ষমতা তো আমাদের নেই, যদি কখনো হয়, তবে তাঁদের এক-একখানা করে ছবি থাকবে এক একটি দেওয়ালে। আর প্রত্যেকটির তলায় থাকবে সুন্দর একটি আল্পনা, মেঝেয় ফরাস। এভাবে একটি সাজানো বসার ঘরের দাদার ভারি শখ।

গোপা : অর্থাৎ খাঁটি দিশি প্রথা। আচ্ছা, তোর দাদা লেখেন নাকি ?

সুমিতা : হ্যাঁ। তুই পড়িসনি? দাদার লেখা সব কাগজেই তো বেরোয়।

গোপা : তাই নাকি? সে কথা তো বলিসনি এদ্দিন। (একটু থেমে) সাড়ে চারটে বাজল, এবার চলি। সোজা কলেজ থেকে আসছি, তা ছাড়া বাড়িতেও কাজ আছে।

ওরা রাস্তায় নেমে গাড়ির সামনে দাঁড়ায়। গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলে—

গোপা : পরশু সন্ধ্যায় গাড়ি পাঠাব। নিশ্চয়ই আসিস ভাই।

সুমিতা : আচ্ছা।

গোপা গাড়িতে ঢোকে ও ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়।

2nd Sequence

গোপার বাড়ির বসবার ঘর। দেওয়ালময় Bengal School স্টাইলে ও অন্য ধরনের ছবি টাঙানো। এ ছাড়া কিছু যুবক-যুবতী সোফায় বসে। একটি ঈষৎ মোটা, মুখে অল্প-বুদ্ধির ছাপ যুবক, নাম বিভাস, বলে ওঠে—

বিভাস : স্ট্রেঞ্জ। এখনো মিস ব্যানার্জী তো কলেজ থেকে ফিরলেন না। (তারপর গাড়ির আওয়াজ শুনে খুব কায়দা করে) আহ্, দেয়ার শি ইজ নাও।

গোপা ঘরে ঢোকে ও বিভাস তাকে লক্ষ করে বলে—

বিভাস : বাহ্ বেশ তো। উৎসবের ব্যাপার নিয়ে আমরা সবাই হয়রান হয়ে গেছি আর আপনি দিব্যি মজাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লিস্‌ন, আপনাকে কীসের চার্জ দেওয়া হয়েছে।

গোপা বিভাসকে অগ্রাহ্য করে একটা সোফায় বসতে বসতে বলে—

গোপা : থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি নিজেই সেটা জেনে নিতে পারব।

ঘরে উপস্থিত গোপার বউদি রমা গোপাকে বলে—

রমা : দ্যাখো গোপা, রিনি কেমন নতুন ডিজাইনের জামা পরেছেন।

রিনি : কী যে বলো রমাদি। কী আর এমন নতুন?

জনৈক ভদ্রলোক : তা পরবেন না। কত বড়ো কালচার্ড ম্যান-এর বোন। আমাদের বিভাস হল ফ্যাশনের রাজা।

গোপা : তাহলে বলো ফ্যাশনেবল। কায়দা জানাকে কালচার বলে না।

বিভাস রাগ প্রকাশ করায়, গোপা তাকে বলে—

গোপা : রাগ করবেন না বিভাসবাবু। আমি বলছি না যে আপনি কালচার্ড নন। আমি শুধু দাদার কথার ভুলটা ধরিয়ে দিলাম।

বিভাস : ফ্যাশনের মধ্যেও কালচারের পরিচয় থাকে মিস ব্যানার্জী।

এবার গোপার দাদা সৌরেন এই কথা-কথান্তর থামানোর জন্য বলে—

সৌরেন : এই রে, বাধবে এবার এখুনি তর্ক। একেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। মার্কেটিং-এর এখনো অনেক বাকি। চলো চলো।

সবাই ঘর থেকে বেরোতে শুরু করে, শুধু গোপার যেন বেরোনোর কোনো ইচ্ছে নেই।

বিভাস : মিস ব্যানার্জী আপনি?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে গোপা বলে—

গোপা : চলুন যাচ্ছি।

এবার সবাই বেরিয়ে যায়।

3rd Sequence

সুমিতার বাড়ি। আরামকেদারায় বসে অনুপ, সুমিতার দাদা বই পড়ছে ও সুমিতা ফ্রেমে আটকানো কাপড়ে এমব্রয়ডারি করছে।

সুমিতা : রাত যে অনেক হল দাদা, খাবে না?

অনুপ : উঁ, ওটা আবার কী তৈরি হচ্ছে?

সুমিতা : একটা ফ্রক।

অনুপ : (অবাক হয়ে) ফ্রক!

সুমিতা : হ্যাঁ। কাল যে বললাম, আমার এক বন্ধু এসে নেমন্তন্ন করে গেছে, তার ভাইঝির জন্মদিনে। যেমন করে হুঁ করেছিলে তখনই বুঝেছিলাম কানে একটা কথাও ঢোকেনি।

অনুপ : হ্যাঁ, শুনেছিলাম বইকি। এই তো বেশ মনে পড়ছে। বলেছিলি এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন। তা, হ্যাঁ রে, বন্ধুটি কোন জাত?

সুমিতা : তোমাদের আধুনিক বর্ণাশ্রম অনুযায়ী ধনী।

অনুপ : তাহলে তো এতটা মাখামাখি শুভ নয়। দেখি। (বোনের হাত থেকে এমব্রয়ডারিটি নিয়ে দ্যাখে। তারপর বলে—) বাঃ, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানিস? ওখানে এর কোনো সমাদরই হবে না। ওরা দেখবে কোনটা কত দামে ভারী।

সুমিতা : সব বড়োলোক তো একরকম নয়।

অনুপ : একরকম। 'অর্থহীন' লোক সম্পর্কে ওরা সবাই একরকম। যেটাকে তোরা বলিস ভালো ব্যবহার, সেটা হল করুণা। সেটা আরো অসহ্য।

সুমিতা : কিন্তু গোপার সাথে পরিচয় হলে তুমি এসব বলতে না। বড়োলোক বলে দেমাক ওর সত্যি নেই। নিজে এসে নেমন্তন্ন করে গেছে। যেতে একবার হবেই। আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে গান নিয়ে। গোপা ধরেছে, গান আমাকে একটা গাইতেই হবে। ভাবছি 'গানের এ অগ্নিমালা' এই গানটিই গাইব।

অনুপ : বেশ তো, এখন একবার গা না।

সুমিতা : না, এখন থাক, এ গান কখনো পুরোনো হবে না তোমার কাছে, এখন খাবে এসো।

অনুপ : আচ্ছা বেশ আমি আসছি। Fade out

Fade in

দু-দিন পরে। সুমিতার বাড়ির ভেতরে সুমিতা প্রস্তুত। বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা যায়। দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে বলে—

সুমিতা : মা গাড়ি এসেছে, আমি যাচ্ছি।

নেপথ্য থেকে মা-র কণ্ঠস্বর শোনা যায়—'আচ্ছা মা এসো।' বেরোতে গিয়ে সুমিতার মনে পড়ে উপহার নেওয়া হয়নি। 'ওই যাঃ! ফ্রকটাই নিতে ভুলে যাচ্ছিলাম' বলে কাগজে মোড়া ফ্রকটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

4th Sequence

গোপার বাড়ির সদর দরজায়। গোপা অতিথিদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। 'সবাই এসে গেছে বুঝি'—প্রশ্ন করেন এক নবাগত। গোপা বলে—

গোপা : না, সবাই এখনো আসেনি। চলুন আপনারা ওপরে।

সিঁড়ির কাছে ধুতি পাঞ্জাবিতে সজ্জিত বিভাসকে দেখা যায়। সে বলে—

বিভাস : হ্যালো মিস বোস, কখন এলেন?

মিস বোস : আরে বিভাসবাবু যে! চেনাই যাচ্ছে না। ধুতি পাঞ্জাবিতে তো দিব্বি মানিয়েছে আপনাকে।

বিভাস : থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। ভালো তো দেখাচ্ছে, কিন্তু ম্যানেজ করতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি।

গোপা : আহা এত ক্লান্ত হতে হচ্ছে সামান্য ধুতি চাদরের জন্য। বরং কোট পাতলুন জড়িয়ে হালকা হয়ে আসুন।

হাসতে হাসতে গোপা ও অতিথিরা ওপরে চলে যায়। বিভাস, গোপার কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুঝতে না পেরে ওদের গমনপথের দিকে বোকা-বোকা মুখে চেয়ে থাকে।

5th Sequence

বসবার ঘর। অভ্যাগতদের ভিড়। হাততালি শোনা যায়। জন্মদিন উপলক্ষে নাচ-গানের আসর বসেছে। একটি তরুণী এগিয়ে এসে ঘোষণা করে—'এইবার মিস সেনের নাচ হবে। তার সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি গান গাইবেন মিস লিলি চ্যাটার্জী।' মিস সেন এসে দাঁড়ান, পিছনে নটরাজের মূর্তি। পাশে অর্গানে এক তরুণী বসে বাজাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে গান শুরু করেন লিলি চ্যাটার্জী।

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা॥
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ওই কেঁদে মরে—
মরণ এবার আনল আমার বরণডালা॥
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা—
আরাম বলে 'এল আমার যাবার পালা'॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাচ শেষে হাততালি পড়ে। দেখা যায় গোপা সুমিতাকে নিয়ে ঢুকছে। গোপা বলে—

গোপা : এই যাঃ, নাচ বোধহয় শেষ হয়ে গেল।

ওরা বসবার ঘরে ঢোকে। প্রথমে গোপা বউদি রমার সঙ্গে সুমিতার পরিচয় করায়।

গোপা : এই আমার বউদি। বউদি, এই আমার বন্ধু সুমিতা, তুমি ওকে একটু বসতে দাও, আমি এখুনি আসছি।

গোপা : (কাউকে জিজ্ঞাসা করে) হ্যাঁ, বেবি কই?

উত্তর পায়—'ওই তো মাসিমার কাছে।'

গোপা : ওকে একটু নীচে নিয়ে চলুন তো, দাদার বন্ধুরা দেখতে চাচ্ছে।

একথা বলে গোপা বেরিয়ে যায়। বউদি (রমা) গ্রাহ্য করে না, সোফা ছেড়ে ওঠেও না। সুমিতা সংকুচিত ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে খুঁজে একটি খালি জায়গা পেয়ে গিয়ে বসে। রমা পাশে বসা এক ভদ্রলোককে বলে—

রমা : রতনগড়ের রাজাবাহাদুর যে প্রেজেন্টটা পাঠিয়েছেন সেটা দেখেছেন মি. গুপ্ত?

মি. গুপ্ত : হ্যাঁ, দেখেছি, এক্সকুইজিট, কম করে হাজার টাকা দাম হবে।

সৌরেন এক দম্পতিকে নিয়ে ঢোকে ও স্ত্রীকে বলে—

সৌরেন : রমা, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস লুথরা।

রমা : ও আসুন, আসুন। নমস্কার। এত দেরি হল যে?

সৌরেন : তা তুমি ওদের দ্যাখো, আমি নীচে যাচ্ছি।

সৌরেন ঘর ছেড়ে 'এক্সকিউজ মি' বলে বেরিয়ে যায়। রমা দাঁড়িয়ে উঠে ওঁদের বলে—

রমা : আসুন, এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। (বলে সবার সামনে গিয়ে থেমে

পরিচয় দিতে থাকে) মিস্টার ডি.লুথরা; আই.সি.এস., আর আমার বোন অরুন্ধতী, মিস্টার লুথরা। আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার এন.পি.গুপ্ত; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেঞ্চুরি ব্যাঙ্ক। মিসেস সেন; প্রফেসর, উইমেন'স কলেজ। রায় বাহাদুর আনন্দ চৌধুরী; জমিদার। প্রিন্সিপাল এ.কে. বসু-র শালার স্ত্রী মিসেস ঘোষ। (তারপর সুমিতার সামনে গিয়ে বলে—) এ হচ্ছে, এ হচ্ছে গোপার বন্ধু। (বলে দ্রুত অন্যদিকে সরে যায়।)

এবার ঘরে উপস্থিত অন্যান্য অভ্যাগতদের বলে—'চলুন, চলুন। বসবেন চলুন।' সবাই বসে পড়ে। মিসেস লুথরা রমাকে উপহার দিয়ে বলেন—

মিসেস লুথরা : তোমার মেয়ে কই ভাই?

রমা : নীচে আছে। (বাক্স খুলে গয়না দেখে বলে—) বাহ্ চমৎকার জিনিসটি তো!

অরুন্ধতী : আর বলো কেন ভাই, এর জন্য সারাটা শহর খুঁজে শেষকালে হ্যামিলটন-এর দোকানে পেলাম। অবশ্য দামটা একটু বেশিই পড়েছে।

সুমিতা মাথা হেঁট করে বসে, মুখ কালো হয়ে এসেছে লজ্জা ও অপমানে। তার দাদার কথা তার মনে পড়ে—'ওরা দেখবে কোনটা কত দামে ভারী।' এবার রমা একটি ঝিকে ডেকে বলে—

রমা : যাও তো কমল, এটা প্রেজেন্ট-এর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে এসো।

মেয়েটি টেবিলের দিকে যায়। আমরা দেখি একটি টেবিলে উপহারের পাহাড় জমেছে। এইসময় গোপা ঘরে ঢোকে।

গোপা : আমার একটু দেরি হয়ে গেল। এবার আপনাদের আমার বন্ধুর গান শোনাচ্ছি। ভারি চমৎকার গায়। (সুমিতার কাছে গিয়ে বলে—) আয়, এদিকে আয়, চল্।

ওরা অর্গানের কাছে যায়। সুমিতা জিজ্ঞেস করে—

সুমিতা : কোন গানটা গাইব বল্ তো?

গোপা : যেটা তোর সব চেয়ে ভালো লাগে।

সুমিতা শুরু করে—

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
গানের এ অগ্নিমালা দেবো কারে
খুঁজে না পাই
নিশিদিন পায়ে যাদের শিকল বাজে,
তারা যে বন্দী সবাই নিজের কাছে,
তারা যে জীবন-তরী নকল সোনায়
করল বোঝাই॥
আমার এ গানের পাখি
সোনার খাঁচায় দেয় না ধরা,

কোকিলের গান সে তো নয়
সোনায় গড়া;
গানে মোর মিলন-দোলায় ভুবন দোলে,
এ গানে পরের লাগি আপন ভোলে;
যে শুধু মিলন-ডোরে বাঁধবে ভুবন
তারেই যে চাই॥

— শৈলেন রায়

কেউ বিশেষ হাততালি দিচ্ছে না দেখে গোপা খুব জোরে অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দিয়ে চলে। এইসময় একটি বেয়ারা এসে বলে—'মিসিবাবা, খানা তৈয়ার হ্যায়।'

গোপা : আচ্ছা। তা আপনারা উঠুন তাহলে। (তারপর একটু থেমে বলে—) ওদের পাঠিয়ে দাও। সুমিতা তুই এদিকে আয়।

সবাই ঘর ছেড়ে চলে যায়। সুমিতা এবার তার শাড়ির তলা থেকে জামার প্যাকেট বার করে গোপাকে দিতে যায়, কিন্তু তখনই বিভাস এসে ঢোকে।

বিভাস : এই যে মিস ব্যানার্জী, আপনাকেই খুঁজছিলাম। সৌরেনদা আপনাকে একবার ডাকছেন।

গোপা : আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

বিভাস : অতিথিদের সত্যিকারের আনন্দ দেবার জন্যে, আই মীন এন্টারটেইন করতে আপনার নিজের একখানা গাওয়া উচিত ছিল।

গোপা : কেন যেটা হল তাতে সত্যিকারের আনন্দ পেলেন না বুঝি ?

বিভাস : না না না, তা বলছি না, উনি তো চমৎকার গান, আই মীন শি সিঙ্স লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল।...অ্যাঁ (এদিক ওদিক তাকিয়ে), এই...হ্যালো মিস গুপ্ত, জাস্ট এ মিনিট...

যখন এদের মধ্যে কথা চলছে তখন বউদি রমা সুমিতার হাতের প্যাকেটটি লক্ষ করে। সুমিতা তা দেখে চট করে আবার প্যাকেটটি শাড়ির নীচে লুকিয়ে ফেলে। গোপা সুমিতার কালো মুখ দেখে জিজ্ঞেস করে—

গোপা : কী রে ?

রমা : (গোপাকে অন্যদিকে ডাকে) গোপা, শোনো এই দিকে।

গোপা : (সুমিতাকে) এক মিনিট, এখনি আসছি।

দরজার বাইরে গিয়ে রমা বলে—

রমা : তোমার ওই সুমিতা প্রেজেন্টের টেবিল থেকে কিছু চুরি করেছে।

গোপা : কী বলছ!

রমা : হ্যাঁ! টেবিল থেকে নিয়ে আঁচলের আড়ালে রাখল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

গোপা : ছিঃ বউদি, ও শুনতে পাবে। এদিকে এসো।

ওরা গোপার শোবার ঘরে চলে যায়।

গোপা : রিনি, তোমরা একটু এ ঘর থেকে যাও তো।

সবাই চলে গেলে গোপা রমাকে বলে—

গোপা : এ অসম্ভব। তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, বউদি। গরিব হলেই লোকে চোর হয় না। পারতে তুমি এর মধ্যে আর কাউকে সন্দেহ করতে? চোখে দেখলেও বলতে সাহস পেতে না। এ হতে পারে না, এ তোমার নিজের মনের মীননেস।

রমা : যা তা বোলো না গোপা।

গোপা : যা তা আবার কী? আমার অতিথিকে এ রকম অপবাদ দেওয়া মানে আমাকেই অপমান করা।

রমা : যতসব ছোটোলোক এনে জোটাবে। বলতে গেলাম বলে আমিই হলাম মীন!

গোপা : ছোটোলোক!

রমা : হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী?

এক বর্ষীয়সী রমণী (গোপার বিনুমাসি) ঘর ছেড়ে না গিয়ে সবটা দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তিনি এবার বলে ওঠেন—

বিনুমাসি : থাক বউমা, এসব নিয়ে আর...তুই চুপ কর্ গোপা।

গোপা : তুমি নিমন্ত্রিতদের ওখানে যাও, বিনুমাসি। আমি এর একটা বিহিত করে আসছি। এত বড়ো অপবাদ দিয়ে সুমিতাকে কিছুতেই এ বাড়ি থেকে যেতে দেবো না। (তারপর বউদিকে লক্ষ করে) তুমি এ ঘরেই থেকো, আমি আসছি। বিনুমাসি, আমাকে এক কাপ চা পাঠিয়ে দিয়ো তো ওঘরে।

গোপা ফিরে বসবার ঘরে গিয়ে দেখে সুমিতা একটি সোফার ওপর মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে। গোপা দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বসে ডাকে 'সুমিতা, সুমিতা।' আবার ছুটে বেরিয়ে পাশের ঘর থেকে রমাকে ডেকে আনে। বলে—

গোপা : বউদি, এসো আমার সঙ্গে।

বসবার ঘরে তারা ফিরে আসে, বেয়ারা জলের গ্লাসের ট্রে নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে গোপা বলে—

গোপা : দেখি, এক গ্লাস আমাকে দাও তো। (গোপা সুমিতার কাছে গিয়ে বসে জলের ঝাপটা দেয়। বলে—) অপমানে লজ্জায় বেচারা ফেইন্ট করেছে।

চোখে পড়ে সুমিতার কোলের কাছে পড়ে থাকা কাগজের প্যাকেট। মোড়ক ছিঁড়ে দ্যাখে ও বউদি রমাকে দেখায়, সুমিতার নিজের হাতে তৈরি সেই ফ্রক ও তার গায়ে পিনে আটকানো কাগজে লেখা 'সুমিতাপিসির স্নেহ উপহার।' রমাকে বলে—

গোপা : এবার যেতে পারো। দয়া করে পরদাটা টেনে দিও। (এইসময় একটি বেয়ারা চা আনে। সুমিতারও জ্ঞান ফিরে আসে। গোপা সস্নেহে বলে—) চা-টা খেয়ে নে তো। (কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে—) এখন কেমন বোধ করছিস?

সুমিতা : ভালো, বাড়ি যাব।

গোপা : চল্।

6th Sequence

গাড়ির মধ্যে দুই বন্ধু বসে। Med-close-shot-এ শুধু দু-জনকেই দেখা যাচ্ছে।

গোপা : তুই আগেই সব বুঝতে পেরেছিস, সে আমি জানতাম না। যাক, যে সন্দেহ করেছিল, তার কাছে প্রমাণ আমি করেছি নিশ্চয়ই। তুই আমাকে ক্ষমা করিস ভাই।

সুমিতা : তোর কোনো অপরাধ নেই তা আমি জানি।

গোপা : নেমন্তন্নের নাম করে কী শাস্তিই না তোকে দিলাম, তোর দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।

সুমিতার বাড়ির কাছে গাড়ি থামে, দু-জনে নেমে দরজার কাছে এলে গোপা বলে—

গোপা : মাকে কিন্তু জানতে দিস না। তিনি ভারি দুঃখ পাবেন। আর...আমার আর কোনোদিন এ বাড়িতে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। আচ্ছা, আজ আমি যাই।

অনুপ দরজা খোলে। গোপার উপস্থিতিতেই বোনকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করে—

অনুপ : এ কী, তুই কাঁদছিস?...আয় ভেতরে আয়। (সুমিতা ভিতরে গেলে অনুপ জিজ্ঞাসা করে—) কী হয়েছে রে?

গোপা : সুমিতা আজ আমাদের বাড়িতে অপমানিত হয়েছে—কী ঘটেছে ওর কাছেই শুনে নেবেন।

অনুপ : এটুকুও ওর কাছ থেকেই শুনতে পারতাম। এর জন্যে আপনার আসার দরকার ছিল না।

গোপা : আমি এসেছি আমাদের পরিবারের হয়ে ক্ষমা চাইতে।

অনুপ : অপরাধ না জেনে ক্ষমা করব বলে কথা দিতে পারি না। কী হয়েছে সুমিতা?

সুমিতা : পরে শুনো, তুই এখন যা গোপা।

গোপা : তোর দাদার কাছে আরো একটু ভদ্র ব্যবহার আশা করেছিলাম সুমিতা। সব কথা না শুনেই....

অনুপ : শোনবার দরকার পড়ে না। নিমন্ত্রিতকে যে বাড়ি থেকে কেঁদে ফিরতে হয়, তাদের পক্ষে এই ব্যবহারই সমীচীন। আপনি বাড়ি যান।

গোপা এবার বিদায় নেয়।

অনুপ : কী হয়েছে রে?

সুমিতা : (কাঁদতে কাঁদতে) গোপার বউদি সন্দেহ করেছে, আমি প্রেজেন্টের টেবিল থেকে একটা জিনিস চুরি করেছি।

অনুপ : চুরি। বলিস কী! চোর! (মুখ কঠিন হয়) অপরাধটা স্ত্রীলোকের নইলে...(একটু থেমে) না হলেই বা কী করা যেত? তুই দুঃখ করিস নে সুমিতা, এ অপমান শুধু তোর একার নয়। গরিব বলে যে জাতটা আছে সেই সমগ্র জাতের। রাত হয়েছে তুই শুতে যা।

সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অনুপ মশারির ভেতরে শুয়ে পড়ে। Fade out

7th Sequence Fade in

অনুপের বাড়ির বাইরে, সিঁড়ি বেয়ে বাড়িওয়ালা নেমে এসে অনুপের কড়া নাড়ে।

বাড়িওয়ালা : মশায় আছেন নাকি ?

ক্রমাগত কড়া নাড়ার শব্দে অনুপের ঘুম ভাঙলে ও দরজা খোলে।

বাড়িওয়ালা : হেঁ হেঁ ... ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি। এতক্ষণ কী করে শুয়ে থাকেন বলুন তো? আমার তো মশাই রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে একটু প্রাতঃভ্রমণ না করলে মেজাজই ভালো হয় না।

অনুপ : এ খবরটা এমন কিছু জরুরি নয় যে শেষ রাত্তিরে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আমাকে সেটা জানিয়ে যেতে হবে।

বাড়িওয়ালা : আজ্ঞে, আমি কী সেইজন্যে এসেছি...আমি এইছি গত মাসের ভাড়াটার জন্যে। 'দিচ্ছি দিচ্ছি' করে তো আরো একমাস পার করে দিলেন। তাই বলছি আজ আমার ভাড়া চাই।

অনুপ : কিন্তু সেইজন্যে এই সময়।

বাড়িওয়ালা : ফিরে এসে তো আপনাকে দেখতে পাব না।

অনুপ : ও আচ্ছা। আজকেই পাবেন।

বাড়িওয়ালা : হ্যাঁ, তাই যেন পাই।

বাড়িওয়ালা বেরিয়ে গেলে অনুপ দরজা বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে ক্যামেরা অনুপের ঘরে পৌঁছলে দেখা যায় অনুপ বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

অনুপ : সুমিতা দরজাটা বন্ধ কর্ তো, আমি বেরোব।

সুমিতা : এত বেলায় না খেয়ে কোথায় যাচ্ছ?

অনুপ : বাড়িওয়ালাকে কথা দিয়েছি, আজকে তাকে কিছু টাকা দিতেই হবে। তাই ওই লেখা-টেখা নিয়ে যাচ্ছি কাগজের অফিসে, দেখি যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়।

অনুপ বেরোতে যাবে এমন সময় সুমিতা বলে ওঠে—

সুমিতা : একী, ঘাড়ের কাছে জামাটা যে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। ছেড়ে দাও, চট করে সেলাই করে দিই।

অনুপ : (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) পাগল। ছুঁচের মতো ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে কি দারিদ্র্যের মতো দৈত্যের সাথে লড়াই করা যায়। (বলে বেরিয়ে যায়।) Fade out

8th Sequence Fade in

পাবলিশার্স-এর অফিসে অনুপ প্রবেশ করে। সেখানে কাজ করে অনুপের এক বন্ধু সমর।

সমর : আরে অনুপ যে, এসো। তোমার যে আর দেখাই নেই। বোসো। ... তারপর, শুনলাম শ্রমিক সঙ্ঘ নিয়ে নাকি খুব মেতে উঠেছ।

অনুপ : মালিক সঙ্ঘ নিয়ে তোমরা এত লোক মেতে আছ, ওখানে কী আর সুবিধে হবে? তাই শ্রমিকদের সঙ্গেই জোটার ইচ্ছে।

সমর : তা তো হল। কিন্তু এই গোলমালে ঢুকে লেখার হাতটি মাটি করবে। তুমি লেখক, দেশের জন্য তোমার যেটুকু করার করবে তুমি লেখার ভিতর দিয়ে।

অনুপ : কিন্তু যাদের নিয়ে আজ লিখতে হবে তাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে লেখাটা লেখা হবে না, হবে রচনা। থাক, ও আলোচনা পরে হবে। উপস্থিত এসেছি কিছু টাকার প্রয়োজনে। এই লেখা দুটো তোমার কাছে নিয়ে এলাম। পারিশ্রমিকটা কিন্তু ভাই এক্ষুনি চাই। বিশেষ দরকার।

সমর : কিন্তু পুরো টাকাটা তো আজই দেওয়া যাবে না ভাই; কাগজের অবস্থাও তো লেখকদেরই মতো...জানোই তো। (টেবিলের ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে দিতে দিতে বলে—) হ্যাঁ, দ্যাখো, খবর পেলাম মডার্ন ইনডাস্ট্রিজ লি. একজন পাবলিসিটি অফিসার চাচ্ছেন। একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না।

অনুপ : ও হবে না, বৃথা পরিশ্রম।

সমর : চেষ্টা করেই দ্যাখো না, হয়েও তো যেতে পারে। এই হল আপিসের ঠিকানা। (ঠিকানা লিখে দিয়ে বলে—) দেরি কোরো না, তুমি বরং আজই যাও।

অনুপ : বেশ দেখা যাক, চাকরি না হোক উমেদারির অভিজ্ঞতাটা হবে।

অনুপ অপিস থেকে বেরিয়ে যায়।

9th Sequence

মডার্ন ইনডাস্ট্রিজ-এর রিসেপশন-এ ইন্টারকম-এর সামনে এক ভদ্রলোক রিসেপশনিস্ট বোসে। অনুপ ঢোকে ও পাশে গিয়ে বসে। ইন্টারকম-এ কথা হয়। দারোয়ানকে ভিতরে পাঠায়। বাইরের 'কল' এলে কথা বলে ও বড়ো সাহেবকে খবর দেয়।

রিসেপশনিস্ট : হ্যালো! স্পিকিং। হোল্ড দ্য লাইন প্লিজ। তারপর ইন্টারকম-এ বলে মি. বাজপেয়ি আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চায়।

ইন্টারকম-এর ভেতর থেকে গলা শোনা যায়—'দ্যাটস ওকে! টুমরো টেন-ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং।'

রিসেপশনিস্ট : অল রাইট স্যর, (তারপর অন্য লাইনে মি. বাজপেয়িকে বলে—) হ্যালো, কাল বেলা দশটায়।

আবার ইন্টারকম-এ কথোপকথন শোনা যায়। 'লিস্‌ন', 'ইয়েস', 'স্যার' 'ভদ্রলোকটিকে পাঠিয়ে দিন'।

রিসেপশনিস্ট দু-বার Buzzer টেপেন ও বেয়ারা আসে।

রিসেপশনিস্ট : (বেয়ারাকে) বড়াসাবকে পাস লে যাও।

অনুপ বেয়ারার সঙ্গে বড়ো সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে। দেখা যায় যে বড়ো সাহেব আর কেউ নন, গোপার দাদা সৌরেন। অনুপের পাঠানো চিঠিটা পড়ে। চিঠির ওপরে লেখা রয়েছে 'শ্রী অনুপ লেখক'।

সৌরেন : 'লেখক' বলে কোনো পদবি কখনো শুনিনি তো।'

অনুপ : 'ঘটক' হতে পারে, 'পাঠক' হতে পারে, 'লেখক' হতে দোষ কী। গুপ্ত, বোস বা চৌধুরী বললে তো বোঝা যাবে না আমি বিদ্যাজীবী। তাই লিখি 'লেখক'।

সৌরেন : ও। নামের আগে অত বড়ো 'শ্রী' জুড়েছেন কেন? তারো কি কোনো একটা তাৎপর্য আছে নাকি ?

অনুপ : আছে বইকি। জীবনের কোনো জায়গায় তো আর শ্রী নেই; 'শ্রী'টুকু টিকে আছে শুধু নামের আগে। তাই ওটা বড়ো করে লিখি আর জোর করে উচ্চারণ করি। (চেয়ারের দিকে তাকিয়ে) বসতে বলবেন বলে তো মনে হচ্ছে না, বসতে পারি কি?

সৌরেন : ও ইয়েস, ও ইয়েস। হুঁ, কী চাই আপনার?

অনুপ : চাকরি। শুনলাম প্রচারকার্যের জন্যে একজন কর্মচারী চাইছেন।

সৌরেন : হুঁ। উপস্থিত কী করেন আপনি?

অনুপ : পদবিতেই বলা হয়েছে।

সৌরেন : না আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কাজকর্ম কী করা হয়?

অনুপ : আপনি জানতে চাইছেন আমার অন্নবস্ত্র জোটে কী করে? লিখে যা আয় হতে পারে সে আন্দাজে আমার পোশাকটা কি বড়ো বেশি উঁচুদরের মনে হচ্ছে? তা আমার ভাগ্য ভালো। এটা কিন্তু আমি বজায় রেখেছি লিখে যা পাই তাই থেকেই।

সৌরেন : আপনার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় না চাকরির উমেদার হয়ে আপনি এসেছেন। আপনি এসেছেন এমন একটা ভাব নিয়ে—'হলে হল, না হলে নেই।' তা কাজটা পেলে মন দিয়ে করবেন তো?

অনুপ : তা করব বইকি।

সৌরেন : কথা হল কী, সাহিত্য সম্বন্ধে একটু আধটু খোঁজখবর আমিও রাখি। আপনার লেখা পড়েছি। আপনার কথাবার্তার মতোই একটু অদ্ভুত ধরনের। পড়ে বেশ ভালোই লেগেছিল। হুঁ...কাজ...কাজ আপনার হবে। পরশু থেকে এসে আপনি কাজে জয়েন করুন। আমাদের ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, কটন মিলস, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, সবগুলোর পাবলিসিটি-র কাজ আপনাকে করতে হবে।

অনুপ : আমার নিয়োগ সম্পর্কে আপনার নির্দেশকেই চরম বলে গ্রহণ করব তাহলে। নিয়োগপত্র একটা পাব নিশ্চয়ই।

সৌরেন : আপনি বুঝি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন না।

অনুপ : করি, যখন ইংরাজিতে কথা বলি। আমি দুটো ভাষাই জানি কিনা, তাই দুটোকে মেশাবার দরকার হয় না।

সৌরেন : (হা হা করে হেসে) তা নিয়োগপত্তর একটা পাবেন বইকি যথা সময়ে, আর

আমার আদেশই চরম আদেশ। অবশ্য সবগুলো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইজ মাই ফাদার। তিনি এখানে নেই। তাই আমাকেই দেখাশুনো করতে হয়।

ইন্টারকম-এ রিসেপশনিস্ট-এর গলা ভেসে আসে 'হ্যালো'। সৌরেন 'ইয়েস' বলার পর আবার রিসেপশনিস্ট-এর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

রিসেপশনিস্ট : আমাদের ম্যাচ ফ্যাক্টরি থেকে ফোন করছে, আপনি কি কাল সাইট ইন্সপেকশন-এ যাবেন?

সৌরেন : কাল! অল রাইট, আফটার অফিস আওয়ারস। (এবার অনুপকে বলে—) হ্যাঁ, আপনি পরশু থেকেই কাজে জয়েন করুন।

অনুপ : (একটু ইতস্তত করে) তা...

সৌরেন : দ্যাটস অল।

অনুপ : আচ্ছা নমস্কার।

10th Sequence

অনুপ বাড়ি ফিরেছে, সুমিতা বসে বসে কিছু একটা পড়ছে।

অনুপ : কীরে, কী করছিস?

সুমিতা : তোমার একটা লেখা পড়ছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে? আজ এত দেরি হল যে?

অনুপ : সমরের কাছে খোঁজ পেয়ে একটা চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলাম। এক কথায় আমাকে নিয়ে নিল। মাইনে দেড়শো।

সুমিতা : বলো কী! এ তো মস্ত সুখবর। দাঁড়াও, আগে মা-কে খবরটা দিয়ে...

অনুপ : (বাধা দিয়ে) দাঁড়া, দাঁড়া, মাকে পরে বলিস।

একটু পরে সুমিতা ও তার মা ঘরে ঢোকে।

সুমিতা : আমাকে বিশ্বাস না হয়, দাদাকে জিজ্ঞেস করবে এসো।

মা : হ্যাঁরে অনু, তোর নাকি চাকরি হয়েছে।

অনুপ : হ্যাঁ, হয়েছে।

মা : ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। নারায়ণকে ডেকে ডেকে কেবলই বলেছি, হে ঠাকুর তোমার অনুপের একটা উপায় করে দাও। আমি যাই নারায়ণকে একটা প্রণাম করে আসি।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সুমিতা খানিকক্ষণ দাদাকে লক্ষ করে বলে—

সুমিতা : তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি চাকরি পেয়ে খুশি হয়েছ।

অনুপ : কী করে হই বল্, সাহিত্য রচনার সময়গুলো পেটের দায়ে বিক্রি করে এলাম বিজ্ঞাপন রচনার জন্যে। এ কী আর খুশি হওয়ার মতো কিছু? সুমিতা, আমাকে এক বাটি চা দিতে পারিস?

সুমিতা : হ্যাঁ, তুমি বোসো, আমি এক্ষুনি আনছি।

অনুপ খাটে গা এলিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করে। Dissolve

Fade in

অনুপ ঠিক ওইভাবে লিখে চলেছে। সুমিতা ঘরে ঢোকে।

সুমিতা : রাত বারোটা বাজল দাদা, ওঠো, খাবে এসো।

অনুপ : অ্যাঁ, বারোটা বাজে? (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, তাই তো। আচ্ছা তুই খাবার দে। আমি একটা কাজ সেরে আসছি।

ক্যামেরা বাড়ির বাইরে। অনুপের বাড়ির দরজা ও ওপরে যাবার সিঁড়ি, দুই-ই দেখা যাচ্ছে। অনুপ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ওপরে চলে যায়। বাড়িওয়ালার বাড়ির কড়া নাড়ে।

11th Sequence

বাড়িওয়ালার বাড়ির ভিতরে মশারির ভিতরে স্বামী-স্ত্রী দু-জনে শুয়ে। কড়া নাড়া শুনে প্রথমে স্ত্রী উঠে বসেন।

স্ত্রী : ওগো শুনছ, ওঠো না। দরজায় কে যেন ঘা দিচ্ছে।

বাড়িওয়ালা : অ্যাঁ, কী বলছ। হ্যাঁ, তাই তো, ও বাবা, এত রাত্তিরে কে এল?

এবার কড়া নাড়ার শব্দ আরো প্রবল হয়।

বাড়িওয়ালা : ও গিন্নি! চালের সন্ধান পেয়ে পুলিশ খানাতল্লাসি করতে এল না তো!

গিন্নি : তোমার এইখান থেকেই ভয়, উঠেই দ্যাখো না, কে।

বাড়িওয়ালা : তাই তো...দেখি। (উঠে, এগোতে এগোতে) তখন অত করে বলেছিলুম যে অ্যাতো চাল ইস্টক করে কাজ নেই। নাও, এখন খাও চাল।

কড়া নাড়ার শব্দ। এবার আরো জোরে। বাড়িওয়ালা ভয়ার্তভাবে জিজ্ঞাসা করে—

বাড়িওয়ালা : কে কে ?

গিন্নি : এইখান থেকেই কে কে করছে, বাইরে গিয়েই দ্যাখো না।

বাড়িওয়ালা : গিন্নি, চাকরটাকে একবার ডাকবে না কি গো!

উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে একটা স্যুটকেসের ভেতর থেকে চাবি বের করে, শোবার ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় যায়। আবার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করে—'কে'। উত্তর আসে 'আমি'।

বাড়িওয়ালা : আমি? আমি কে? সবাই তো আমি।

অনুপ : (দরজার ওপার থেকে) খুলুন, আমি অনুপ।

বাড়িওয়ালা : ও।

তবু জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখে নিশ্চিত হয়ে তবে সদর দরজার তালা খোলে।

বাড়িওয়ালা : কী, ব্যাপার কী?

অনুপ : আপনার ভাড়াটা দিতে এলাম।

বাড়িওয়ালা : ভাড়া। ভাড়ার জন্য এত রাত্তিরে?

অনুপ : কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। সেইজন্যে...

বাড়িওয়ালা : সেইজন্যে মাঝরাত্তিরে এসে এরকম দুমদাম করবেন? এটা কি ভাড়া দেবার সময়?

অনুপ : শেষ রাত্তিরটাও তাগিদ দেবার সময় নয়।

বাড়িওয়ালা : ও, সেইজন্যেই বুঝি এখন জ্বালাতন করতে এয়েছেন। আপনি জানেন আমার স্ত্রী রীতিমতন ভয় পেয়েছেন। তার আবার হার্টের ব্যায়রাম।

দ্যাখা যায় শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গিন্নি ফিক ফিক করে হাসছেন।

বাড়িওয়ালা : যদি হার্টফেল করত?

অনুপ : এতে এত ভয় পাবার কী আছে?

বাড়িওয়ালা : ভ...ভ...ভয় পাবার কী আছে! আপনি কী বুঝবেন। ভয় পাবে না? (তারপর অনুপের কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে ফিসফিস করে বলেন—) জানেন, ঘরে পঞ্চাশ মন চাল ইস্টক করে রেখেছি। কখন কী হয়...

অনুপ : (ফিসফিস করে) কিছু একটা হওয়াই তো উচিত তাহলে।

বাড়িওয়ালা : (সরে গিয়ে আবার রাগতভাবে) থাক মশাই থাক। টাকা থাকলে নিজেও রাখতেন।

অনুপ : না, রাখতাম না...এই নিন আপনার ভাড়া, রসিদটা কাল সকালে পাঠিয়ে দেবেন।

বলে ঘুরে চলে যায়। বাড়িওয়ালাও 'আচ্ছা' বলে দরজা বন্ধ করে।

12th Sequence

সৌরেনের অফিস। রিসেপশনিস্টও উপস্থিত।

সৌরেন : এখুনি বম্বে অফিসে টেলিগ্রাম করে দিন।

রিসেপশনিস্ট : অল রাইট স্যার।

এবার রিসেপশনিস্ট বেরিয়ে যায়। অনুপ ঢোকে। বলে—

অনুপ : আপনি আমাকে ডেকেছেন?

সৌরেন : হ্যাঁ, বসুন। এই বিজ্ঞাপনদুটো দেখতে হবে। আর হ্যাঁ, দেখুন...একটা বক্তৃতা লিখতে হবে। এমন সব বিপদে ফ্যালে এরা। এই দেখুন না...কাল ছাত্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। আমাকে তাদের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হতে হবে। কী যে করি আমি...এ সব কখন করি বলুন তো? এদিকে নিজের কাজের চাপেই অস্থির।

অনুপ : তা তো বটেই।

সৌরেন : আপনি একটা কাজ করুন। বেশ গুছিয়ে লিখে ফেলুন তো একটা বক্তৃতা। অ্যাঁ...আর দেখুন, হ্যাঁ, (হাসতে হাসতে) দু-চার জায়গায় 'বুর্জোয়া' কথাটা বেশ মানানসই রকম বসিয়ে দেবেন। তা ছাড়া 'ধনতন্ত্র' আর বড়োলোকদের গালাগালি দিয়ে বেশ গালভরা সব বড়ো বড়ো কথা লিখবেন।

অনুপ : কিন্তু সেসব গাল যে আপনার নিজের গায়েই পড়বে।

সৌরেন : তা পড়বে। ছাত্রদের কাছে পপুলার হতে গেলে ওসব কথা বলতেই হবে। গাল নিজেই দিই, আর পরেই দিক। মাথা আমাদের আছে, তাই আমরাই চিরকাল থাকব সমাজের মাথা।

অনুপ : মাথা থাক না থাক, মাথা কেনার পয়সা থাকাটা কম কথা নয়।

সৌরেন : (গম্ভীর হয়ে গিয়ে) আপনি যে রকম কথাবার্তা বলেন, বাবার কাছে হলে চাকরি আপনার থাকত না।...আমার আবার কেমন একটা উইকনেস আছে এই সমস্ত ইন্টেলেকচুয়ালদের সম্পর্কে। আরে মশাই, পয়সা কী আর অমনি আসে। আমরা মাথা খাটিয়ে এতগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি বলেই না আপনাদের মতো শত শত লোক করে খাচ্ছে।

অনুপ : করে খাচ্ছে না, বলুন 'না খেয়ে করছে'।

এইসময় ইন্টারকম-এ রিসেপশনিস্ট বলে—

রিসেপশনিস্ট : স্যার, আমাদের কোম্পানির...

সৌরেন : (রেগে চেঁচিয়ে ওঠে) সব কথা আমাকে...ম্যানেজার কী করছে?

অনুপ : (সৌরেনের উত্তেজনা প্রশমিত হলে) লেখাটা আপনার কবে চাই?

সৌরেন : পরশু হলেই চলবে।

অনুপ : আচ্ছা, পাবেন।

13th Sequence

ছাত্রসঙ্ঘের সভা। ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে সৌরেন। টেবিলের চতুর্দিকে বসে বিভাস, গোপা, বিভাসের বোন রিনি প্রভৃতি। হাততালি পড়ছে। সৌরেন তার বক্তৃতার উপান্তে পৌঁছে বলে—

সৌরেন : আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবার সজোরে হাততালি পড়ে। সবাই বলতে থাকে 'অদ্ভুত', 'অতি সুন্দর', 'চমৎকার'। ডায়াস-এর ওপরে ছাত্রসঙ্ঘের কেউ বলে—'যেমন ভাষার জোর তেমনি ভাবের গভীরতা। এমন বক্তৃতা ক্বচিৎ শোনা যায়।'

বিভাস : (উঠে দাঁড়িয়ে) আই ওয়ান্ট টু স্পিক, মানে আমিও কিছু বলতে চাই।

রব ওঠে 'বলুন' 'বলুন'।

বিভাস : এই যে চমৎকার বক্তৃতা আপনারা শুনলেন তার জন্য আমিও খানিকটা গৌরব দাবি করি, কারণ সৌরেনদাকে আমিই এখানে জোর করে এনেছি। সো লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনাদের উচিত আমাকে একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়া।

তুমুল হাততালি পড়ে। কর্মকর্তাদের একজন যিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেন—'তাহলে আজকের মতন'...

হঠাৎ একটি দাড়িওয়ালা লোক ('যুগাবর্ত' কাগজের সম্পাদক) সৌরেনের দিকে এগিয়ে এসে বলে—

সম্পাদক : এক্সকিউজ মি, আপনার মতো লোক 'যুগাবর্ত' কাগজ নিশ্চয়ই পড়েন। আমিই তার সম্পাদক। আপনার বক্তৃতাটি যদি দয়া করে আমাদের কাগজে...

সৌরেন : তা বেশ, নিন। আপনি বুঝি কবিতাও লেখেন?

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ, নমস্কার। দেখুন, আপনাকে ডিসটার্ব করলাম না তো?

সৌরেন : না না, কিছুমাত্র না।

সৌরেন ও তার সঙ্গীসাথীরা সব ভিড় ঠেলে বেরোতে থাকে। এবার আরেকজন লোক এগিয়ে এসে বলে—

লোকটি : আপনাকে কিন্তু আমাদের আগামী সাহিত্যসভায় সভাপতি হতেই হবে।

সৌরেন : আমাকে আবার...

লোকটি : না না কোনো আপত্তিই শুনব না।

সৌরেন : আচ্ছা পরে ভেবে দেখা যাবে।

লোকটি : অনুমতি কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম।

এবার ধীরে ধীরে সবাই বেরিয়ে যায়।

14th Sequence

ট্রামের চাকা। ট্রামের ভেতরে অনুপ বসে একটা বই পড়ছে। পাশের থেকে কেউ বলে—

জনৈক : দেখেছিস, চালের দোকানের সামনে কেমনি লম্বা লাইন হয়েছে।

অনুপ ট্রামের ভিতর থেকে বাইরে চেয়ে দ্যাখে।

(Cut to)

অনুপ অফিসে ঢুকলে দারোয়ান বলে—

দারোয়ান : বড়া সাহাব আপকো জলদি বুলাতে হ্যায়।

সৌরেনের অফিসে অন্য কোনো কর্মচারী সৌরেনের সঙ্গে কথা বলছে।

কর্মচারী : বাজার ওঠা-পড়া করছে। তাতে কী রিস্ক নেওয়া উচিত হবে। এক লাখ মন চাল, সোজা কথা তো নয়।

অনুপ ঘরে ঢোকে ও এই কথা শুনতে পায়।

সৌরেন : এখন ছাড়ব না। বাজার কি কারোর চেয়ে আমি কম বুঝি? কেনা দামের চার গুণ চড়লে তারপর দেখা যাবে। হ্যাঁ, আপনি এখন যান, (অনুপকে দেখিয়ে) ওঁর সাথে আমার একটু দরকার আছে।

কর্মচারীটি বেরিয়ে যাওয়ার পর অনুপ সৌরেনকে প্রশ্ন করে—

অনুপ : আপনার হাতে এক লাখ মন চাল আছে।

সৌরেন : হ্যাঁ, কেন, আপনার নিজের কিছু দরকার আছে।

অনুপ : না, নিজের জন্যে বলছি না।

সৌরেন : তবে দালালি করবার ইচ্ছে আছে? করেন তো ভালো। একসঙ্গে বেশ কিছু মোটা টাকা পেয়ে যাবেন।

অনুপ : (হেসে) মোটা টাকা পাওয়ার মতো মোটা ভাগ্য কি আমাদের? সে কথা নয়। আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি এখন চালগুলো কিছুতেই ছাড়বেন না। আপনারা এইভাবে মালগুলো আটক করে রেখেছেন বলেই না দেশের লোকগুলোর মধ্যে একটু নিয়মানুবর্তিতা জন্মেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে শিখছে।

সৌরেন : ও আপনি কৌতুক করছেন?

অনুপ : (হাসতে হাসতে) এত বড়ো একটা কৌতুকের ব্যাপার, কৌতুক করব না? যাক, আমার ওপর কী আদেশ বলুন।

সৌরেন : শুনুন, সেদিন যে বক্তৃতাটা লিখে দিয়েছিলেন সেটা পড়ে খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া গিয়েছে।

অনুপ : আমার সৌভাগ্য।

সৌরেন : এই দেখুন না, আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। একী, আপনি বসুন না, বসুন। ছাত্ররা আবার ধরেছে, তাদের আগামী সাহিত্যসভার সভাপতি হতে হবে। অত বললাম যে আমার সময় হবে না। সে কি শোনে? আপনি এক কাজ করুন তো, বেশ খেটে একটা অভিভাষণ লিখে ফেলুন তো।

অনুপ : কিন্তু অফিসের কাজ?

সৌরেন : ও সব বিজ্ঞাপনের ভাবনা আপনি ছেড়ে দিন। সে যে কাউকে দিয়ে লেখানো যাবে।

অনুপ : আচ্ছা। (চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।)

সৌরেন : হ্যাঁ, শুনুন। কাল রবিবার আছে, কাল আসুন না আমাদের বাড়ি। সেখানে বসেই লিখবেন।

অনুপ : বাড়ি...কেন? এইখানে বসেই লেখা যাবে।

সৌরেন : না, বাড়িতেই আসুন, সেখানে মস্ত লাইব্রেরি রয়েছে আমার। গিয়ে দেখবেন বই এর কী সিলেকশন, যে বই চাইবেন পাবেন। আর তা ছাড়া সবরকম সুবিধেই করে দেবো।

অনুপ : অসুবিধেয় লিখে আমার অভ্যেস আছে। তবে আপনার কথা শুনে আমার লোভ হচ্ছে। আচ্ছা কাল সকালে যাব।

15th Sequence

সৌরেনের বাড়ির বাইরে টুলে বসা দারোয়ানকে অনুপ জিজ্ঞেস করে—

অনুপ : সৌরেনবাবু আছেন?

দারোয়ান : ছোটা সাব? হ্যায়। আপ স্লিপ দিজিয়ে।

স্লিপ নিয়ে দারোয়ান ভিতরে যায়। অনুপ টুলে বসে পড়ে। সৌরেন বেরিয়ে আসে।

সৌরেন : একী, এখানে বসে। ব্যাটা বুঝতে পারেনি।

অনুপ : বুঝতে পেরেছে বলেই এখানে বসিয়েছে।

সৌরেন : হা হা। কী যে বলেন আপনি। ভিতরে আসুন, ভেতরে আসুন।

Cut to

লাইব্রেরি ওপরে। বিরাট ঘর, দেওয়ালময় কাচের আলমারি ও কাঠের তাকে বই। ইতস্তত ছোটো ছোটো স্ট্যাচু রাখা। লাইব্রেরি-র ভেতর দিয়ে ওপরে সিঁড়ি উঠে গেছে। টেবিল ও সংলগ্ন চেয়ার ছাড়াও আরামকেদারা পাতা।

সৌরেন : দেখুন একবার, কী চমৎকার লাইব্রেরি করেছি। বেশ আরাম করে বসবার বন্দোবস্তও রয়েছে।

ঘরের মধ্যে একটা বড়ো দোলনা ঝোলানো রয়েছে।

সৌরেন : এই যে স্যুইং-চেয়ারটা দেখছেন এটা গুজরাট থেকে আনিয়েছি। বসে আপনা থেকেই চোখ একেবারে বুজে আসে।

অনুপ : লাইব্রেরি-র উপযুক্ত চেয়ারই বটে।

সৌরেন : (তির্যক উক্তিতে থতমত খেয়ে) না মানে, তা দরকার বইকি, পড়তে পড়তে ঘুমাবার ইচ্ছে তো হয়। হ্যাঁ, এই ছবিটা দেখছেন, দিস ইজ এ রিয়েল যামিনী রায়। এবারকার একজিবিশন থেকে কিনেছি। কেমন?

অনুপ : চমৎকার।

সৌরেন : (ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে) হ্যাঁ, আর এই স্ক্রিন-টা কোথা থেকে কিনেছি জানেন?

অনুপ ওদিকে না তাকিয়ে বই-এর তাকের দিকে যায়।

অনুপ : আগে বইগুলো দেখা যাক।

সৌরেন : বই এর কথা যদি বললেন, কোনো সাবজেক্ট বাদ রাখিনি। লিটারেচার, ফিলজফি, সাইকোলজি...(ওপরের তাকের দিকে নির্দেশ করে) আর ওপরে অ্যানথ্রোপলজি, সোশিওলজি, বায়োলজি।

অনুপ একটা না-পড়া বই-এর জোড়া পাতা আঙুল দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে—

অনুপ : আপনি বুঝি খুব পড়াশুনা করেন?

সৌরেন : করতে তো চাই, কিন্তু সময় পাই কই বলুন?

অনুপ : আপনার সাহিত্যের সংগ্রহ দেখছি বেশ ভালো। নির্বাচন করেছেন কে?

সৌরেন : কে আবার, আমি। কোন বই কার লেখা সমস্ত নাম আমার মুখস্থ।...হ্যাঁ আপনি এই টেবিলটাতে এসে এবার বসুন। এখন যে বই খুশি নিয়ে আপনি লিখতে শুরু করে দিন। কেউ টুঁ শব্দটি করতে আসবে না, আমি একটা চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি চা সিগারেট যখন যা প্রয়োজন হুকুম করলেই এনে দেবে।

অনুপ গিয়ে চেয়ারে বসে। সৌরেন বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—

সৌরেন : হ্যাঁ আপনি লিখুন, আমার জন্য আবার একজন অপিসরুমে ওয়েট করছেন। কাজের কী আর শেষ আছে মশাই। একটু নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই।

অনুপ আর একটা আলমারি থেকে বই বাছতে থাকে। সৌরেন ঘরের বাইরে গিয়ে দ্যাখে গোপা বই হাতে লাইব্রেরিতে ঢুকছে। তাকে বলে—

সৌরেন : লাইব্রেরিতে একটা চাকর পাঠিয়ে দিস তো। বলে দিস ওইখানেই যেন থাকে।

গোপা : এই বইগুলো রেখে এসে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গোপা ঘরে ঢোকে। দরজার দিকে পিঠ-করা গোপাকে দেখে, চাকর ভেবে অনুপ বলে—

অনুপ : এক পেয়ালা চা আনো।

গোপা বই রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। খানিক পরে যখন বেয়ারার সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢোকে তখন অনুপ মন দিয়ে বই পড়ছে। গোপা নিজে চা ঢালতে থাকে। মুখ না তুলেই অনুপ বলে—

অনুপ : চলে যেয়ো না। কাছাকাছি থেকো, ডেকে যেন পাই। তোমার নাম কী?

গোপা : গোপা।

অনুপ : (চমকে তাকিয়ে বলে—) আপনি...এখানে। (তারপর উঠে দাঁড়ায়।)

গোপা : আমি এখানে, কারণ এটাই আমার বাড়ি।

অনুপ : সৌরেনবাবু?

গোপা : আমার দাদা।

অনুপ একটু ভেবে বলে—

অনুপ : সুমিতার সেই নেমন্তন্ন বাড়ি। যাক, অজান্তে একটা উপকার করলেন। ইচ্ছে থাকলেও চাকরিটা ছাড়া যাচ্ছিল না, নেহাত টাকার প্রয়োজন। আপনার দাদাকে একবার ডাকুন।

গোপা : আপনি চা-টা খেয়ে নিন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

অনুপ : ধন্যবাদ, আপনি সৌরেনবাবুকে ডাকুন। দেখুন ঠিকঠিক অবাক মানুষ একবারই হয়। আপনার আশা অনুযায়ী ভদ্রতা যে আমার মধ্যে নেই, সেটা তো প্রথম পরিচয়েই আবিষ্কার করেছিলেন। আসলে আবিষ্কারই করেননি, সেটা জানিয়ে দিয়েও এসেছিলেন, আপনার দাদাকে একবার ডাকুন।

গোপা বেরিয়ে যায়।

(Cut to)

ভেতরের একটি ঘরে গোপা ও সৌরেন।

সৌরেন : তোরা সব এমন কাণ্ড করিস, বিপদে পড়তে হয় আমাকে। তোর কী দরকার ছিল ও ঘরে যাবার।

গোপা : বা রে, আমি কী করে জানব। আমি গিয়েছিলাম বইগুলো রাখতে।

সৌরেন : কী বিপদ বল্ দেখি। লোকটা যদি এখন চলে যায়, এত বড়ো অভিভাষণ আমি কখন বসে লিখি?

গোপা : ও, সেদিনকার সেই বক্তৃতাটা বুঝি...

সৌরেন : অ্যাঁ, তাতে তোমার দরকার কী বাপু? সব কথাতেই থাকতে হবে। যাও নিজের কাজে যাও।

গোপা : যাচ্ছি। চলো আমাকে একটা বই আনতে হবে।

(Cut to)

দু-জনে ঘরে ঢোকে। এবার অনুপকে সৌরেন বলে—

সৌরেন : সুমিতা আপনার বোন? সত্যি, সে একটা ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে। যাক যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। ভুল দেখুন সবারই তো হয়। নাও লেট্স ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।

অনুপ : তা হয় না সৌরেনবাবু। আমার পক্ষে আর এখানে কাজ করা সম্ভব নয়।

সৌরেন : বসুন বসুন, ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখুন। ঝোঁকের মাথায় এমন চাকরিটা আপনি ছেড়ে দেবেন। দেখেছেন তো এদ্দিন, শুধু সাহিত্য করে কি চলে? বাঁচতে হলে টাকারও প্রয়োজন।

অনুপ : (হো হো করে হেসে) শুনুন সৌরেনবাবু। অভুক্ত থাকার চেয়ে পেট ভরে খেতে পাওয়া যে সুখের, হাঁটার চেয়ে মোটরে চড়া যে বেশি আরামদায়ক, সেটা বুঝবার জন্য উপদেশের দরকার হয় না। তবু একটা কথা কি জানেন...

সৌরেন : আসুন আসুন বসা যাক ।

গোপা একটু দূরে বই-এর আলমারির কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলে ওঠে—

গোপা : এত খোশামুদি করার কী দরকার, দাদা। টাকা ঢাললে লোকের অভাব হবে না।

অনুপ : হবে। শাড়ি গাড়ি আর কেরানির মতো টাকা ঢাললে এ বস্তু মেলে না। শিল্পী বা সাহিত্যিক অত সুলভ নয় গোপা দেবী। আচ্ছা সৌরেনবাবু নমস্কার। চললাম। (বলে বেরিয়ে যায়।)

সৌরেন : ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার মুখে এনেছিলুম, দিলি সব গোলমাল করে। টাকা ঢাললে কী পাওয়া যায় না যায়, তোর চেয়ে আমি ঢের ভালো বুঝি। কে বলেছিল তোকে মাঝে পড়ে কথা বলতে। যা। যত খুশি টাকা কবুল করে আন্ দেখি লোকটাকে ফিরিয়ে। প্রমাণ কর যে টাকা ঢাললেই সব মেলে।

গোপা বেরিয়ে যায়।

(Cut to)

গাড়ি নিয়ে অনুপের বাড়ির দিকে যেতে পথে অনুপকে হেঁটে যেতে দেখে ডাকে 'অনুপবাবু'। অনুপ থামে না। গাড়ি ফলো করে। অনুপকে অতিক্রম করে গাড়ি থামলে গোপা নেমে ছুটে যায়। বলে—

গোপা : অনুপবাবু শুনুন।

অনুপ : বাহ্, আপনি নিজেই এসেছেন খোশামোদ করতে।

গোপা : আপনাকে দাদা একবার ডেকেছেন। খুবই নাকি...

অনুপ : আপনার দাদার চাকর নই আমি।

গোপা : একটু আগেও ছিলেন।

অনুপ : ছিলাম। কিন্তু এখন আর নই।

বলে আবার হাঁটতে শুরু করে। গোপা গাড়িতে ওঠে।

(Cut to)

বাড়ি ফিরে গোপা সৌরেনকে বলে—

সৌরেন : আমি জানতাম তোকে ফিরে আসতে হবে। টাকার লোভে ফেরবার লোক ওরা নয়। কিন্তু এত বড়ো একটা অভিভাষণ...

গোপা : কী দরকার দাদা এমন লোকদের খোশামোদ করে? আমার মনে হয়, একটু চেষ্টা করলে তুমি নিজেই ওরকম লিখতে পারো।

সৌরেন : চেষ্টা! হোয়াট ডু ইউ মীন? এত বড়ো ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, কটন মিল, জুট মিল চালাচ্ছি আর সামান্য একটা অভিভাষণ লিখতে পারব না। দেখিস ওর থেকে ভালো লিখব।

(Cut to)

লাইব্রেরিতে বই-এর স্তূপ। ক্যামেরা একটু Close-এ এগোলে দেখা যায় সৌরেন একটার পর একটা বই খুলে ঘাঁটছে। বেয়ারা এক পেয়ালা চা আনে। সৌরেন প্রায় চিৎকার করে বলে—

সৌরেন : নেই, নেই, শরবত লাও।

মাটিতে ছেঁড়া কাগজের ঢের জমেছে। খানিক পরে সৌরেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—

সৌরেন : নাঃ, এ আমার কম্ম নয়।

16th Sequence

বাড়িতে সুমিতা অগোছালো বই-এর পাশে বসে। খাটে অনুপ বই পড়ছে।

সুমিতা : নাঃ, গোছানো ঘর তোমার ধাতে সইবে না, এই তো কালকেই সব বইগুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম। এ কী। আবার তোমার উপন্যাসের ম্যানুস্ক্রিপ্ট এভাবে ফেলে রেখেছ?

অনুপ : জানিস সুমিতা, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

সুমিতা : ছেড়ে দিয়েছ? কেন?

অনুপ : ধাতে সইল না, কী করি বল্।

এইসময় কড়া-নাড়া শোনা যায়। অনুপ বলে—

অনুপ : দ্যাখ্ তো কে?

সুমিতা দরজা খোলে। দরজায় সৌরেন দাঁড়িয়ে আছে।

সৌরেন : অনুপবাবু বাড়ি আছেন?

সুমিতা : আসুন।

সৌরেনকে অনুপের ঘরে নিয়ে যায়।

সৌরেন : (অনুপকে দেখে) ওঃ, এই তো।

অনুপ : বসুন।

সৌরেন : (সুমিতার প্রতি) আপনারই নাম...গোপার বন্ধু যখন তখন অনায়াসে তুমি বলা যেতে পারে।

সুমিতা : নিশ্চয়ই, তুমি বলবেন বইকি। আমার নাম সুমিতা।

সৌরেন : শুনেছ বোধহয় তোমার দাদা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। যারা তাঁর বোনকে অপমান করেছিল তাদের অধীনে চাকরি তিনি আর করবেন না।

সুমিতা : ও, এইজন্যে।

সৌরেন : জানতে না বুঝি। ব্যাপারটা উনি এত সহজে শেষ করে এলেন যেন কিছুই হয়নি। তখন থেকে ভাবছি, এই দুর্দিনে এমন একটা চাকরি যে অবহেলা করতে পারে...যাক, শোনো সুমিতা, আমাদের বাড়ির সে অন্যায়টা তোমাকে ভুলতে হবে। নিশ্চয় করে জানো যে এটা ভুল। আশা করি অনায়াসেই ভুলতে পারবে।

অনুপ : কেবলমাত্র ভুলই যদি হত তাহলে ভোলা কঠিন হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুলের চেয়ে এ জাতীয় ভুল কী করে সম্ভব হল সেটাই বড়ো কথা।

সৌরেন : এই দেখুন। আপনি আবার ভয়ংকর সব বড়ো বড়ো কথায় চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা ওসব কথা যাক, এখন কাজের কথা বলি, চাকরি করবেন না, বেশ ভালো কথা, তা বলে যোগাযোগটা নষ্ট করতে হবে এর তো কোনো মানে নেই। আসুন না, নতুন কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট-এ আসা যাক। জাস্ট এ বিজনেস ডিল। আপনি আমার যে লেখাটা হাতে নিয়েছেন সেটা শেষ করুন।

অনুপ হাসতে থাকে।

সৌরেন : না না, হাসির কথা নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছি। আচ্ছা, আর একটা ব্যবস্থাও তো করা যায়। আপনি কোনো উপন্যাস লেখেননি?

অনুপ : হ্যাঁ লিখেছি।

সৌরেন : ছাপান না কেন?

অনুপ : কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার, অর্থাভাব।

সৌরেন : দিন আপনার ম্যানুস্ক্রিপ্ট। আমি ছাপিয়ে বার করে দেবো। বিক্রির সবটাই আপনার। রাজি?

অনুপ : চুক্তির দরকার নেই। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ও লেখাটা আমি এমনিই লিখে দেবো।

সৌরেন : ওসব রাগের কথা ছাড়ুন, কই দিন তো আপনার উপন্যাসখানা।

অনুপ : আচ্ছা উপন্যাসের কথা না হয় পরে ভেবে দেখা যাবে।

সৌরেন : পরে ভেবে দেখা যাবে-টাবে না। কাল আপনি আপনার ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আমার বাড়িতে আসছেন কথা দিন।

অনুপ : ওইখানেই আমার আপত্তি। আপনার বাড়ি গিয়ে আমি আর লিখতে পারব না। তার চেয়ে আপনি আপনার কাগজপত্তরগুলো এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

সৌরেন : না, সে হবে না, আমার বাড়িতেই আপনাকে আসতে হবে। তার প্রথম কারণ আমাদের উভয়পক্ষের যে তিক্ততা জমে উঠেছে সেটা দূর করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত আমার লাইব্রেরিটা তো এখানে উঠিয়ে আনা সম্ভব নয়। অত বই-এর মধ্যে বসে লিখতে কত সুবিধে বলুন তো।

অনুপ : তা বটে। ভালোভাবে লিখতে হলে বই-টইগুলো একটু দেখা দরকার।

সৌরেন : তা হলে তাই কথা রইল। আপনার উপন্যাসের ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনি আসছেন কাল সকালে, আমি আপনার জন্য ওয়েট করব।

অনুপ : বেশ যাব।

সৌরেন : আচ্ছা সুমিতা, আজ তাহলে যাই। আর একদিন এসে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব কেমন, নমস্কার অনুপবাবু।

অনুপ : নমস্কার।

সৌরেন বেরিয়ে গেলে সুমিতা বলে—

সুমিতা : লোকটি কিন্তু চমৎকার।

অনুপ : হ্যাঁ, চমৎকারই বটে। ওদের একটা চমৎকার গুণ, স্বার্থের পেছনে অন্ধ হয়ে ছোটা।

17th Sequence

অনুপ গেট দিয়ে সৌরেনের বাড়িতে ঢুকছে। জানলার বাইরে একটি গাছে জড়ানো মালতীলতা দুলছে। ক্যামেরা track back করলে দেখা যায় বাড়ির ভিতরে একটি ঘরে গোপা অর্গান বাজিয়ে গান গাইছে।

ওই মালতীলতা দোলে
পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে॥
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপন-ভোলা—
মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে॥ ...

গান চলাকালীন পরদা সরিয়ে অনুপ প্রবেশ করে। একটা সোফায় গিয়ে বসে। গোপা ওকে না দেখে গেয়ে চলে—

...জানি নে কোথায় জাগ ওগো বন্ধু পরবাসী—
কোন্ নিভৃত বাতায়নে।
সেথা নিশীথের জল-ভরা কণ্ঠে
কোন্ বিরহিণীর বাণী তোমারে কী যায় বলে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসে থাকা গোপার পিছনদিকে একটি স্ট্যাচু। গান শেষ হওয়ার পর অনুপ ওর কাছে এসে বলে—

অনুপ : বাঃ, অপূর্ব আপনার কণ্ঠস্বর, রীতিমতো গুণী আপনি।

গোপা : আপনার প্রশংসা শোনার মতো প্রচুর অবসর আমার নেই।

ঘরে তিব্বতি তাঙ্কা, আরো কিছু প্লাস্টার অফ প্যারিস-এর তৈরি স্ট্যাচু, হাতকাটা ভেনাস-এর মূর্তি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গৃহসজ্জার বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে।

গোপা এবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অনুপ হো হো করে হাসতে থাকে। এইসময় সৌরেন ঢোকে। বলে—

সৌরেন : এই যে, কখন এলেন?

অনুপ : আপনার বোন তো চমৎকার গাইতে পারেন।

সৌরেন : গান শুনলেন বুঝি? কোথায় গেল গোপা?

অনুপ : বোধহয় ভেতরে গেলেন।

সৌরেন : ও আসুন আসুন, বসা যাক। তবে এখানে আর কেন? একেবারে লাইব্রেরিতেই চলুন।

অনুপ : বেশ চলুন।

(Cut to)

লাইব্রেরিতে গোপাকে দেখে সৌরেন বলে—

সৌরেন : এই যে গোপা, তুই এখানে। অনুপবাবু তোর গানের খুব প্রশংসা করছিলেন। এসব গুণীলোকদের প্রশংসা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভালো দেখে আর একখানা গান শোনা দেখি। হ্যাঁ, তার আগে এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে আয়।

গোপা : গান আমি আর এখন গাইতে পারব না। তবে চায়ের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু চা কী তিনি এখানে খাবেন?

অনুপ হাসে হো হো করে।

গোপা : এতে হাসির কথা কী হল!

বলে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সৌরেন : (চেঁচিয়ে) চায়ের কথা ভুলিসনে। (তারপর অনুপকে বলে—) আসুন বসা যাক। নাঃ, ওর মেজাজটা বোধহয় ভালো নেই। বাবা আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা একেবারে খেয়েছেন। সবার ছোটো, মা নেই। যাক আপনি লিখতে বসে যান। আমার তো আবার অপিসের তাড়া আছে। যাবার আগে আর একবার খোঁজ নেব।

সৌরেন বেরিয়ে যায়। অনুপ টেবিলে বসে একটা বই খুলে পড়তে বসে। কিছুক্ষণ পরে গোপা বেয়ারার সাথে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢোকে ও বেয়ারার হাত থেকে ট্রে নিয়ে টেবিলে রেখে কাপে চা ঢালতে থাকে।

গোপা : চিনি ক-চামচে?

অনুপ : ক-চামচেতে আমার জিভের আন্দাজ মিষ্টি হবে তা আমি কী করে বলব। আমি তো নিজের হাতে চা করে খাই না। আতিথেয়তার আপদ চাপিয়ে আপনাকে কী বিপদেই না ফেলা হয়েছে।

গোপা : আপনি বোধহয় অতিথিকে আপদ মনে করেন।

অনুপ : অতিথির মধ্যেও বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় বলে দুটো কথা আছে তো।

এবার গোপার ঢালা চায়ে এক চুমুক দিয়ে বলে—

অনুপ : নাঃ, এত কমে চলবে না।

গোপা : চিনি দেওয়াই হয়নি। আপনি আন্দাজমতো ঢেলে নিন।

অনুপ 'ও' বলে হেসে চায়ে চিনি গুলে নেয় ও একটা বিস্কুটে কামড় দিয়ে বলে—

অনুপ : বাঃ, এই বিস্কুটগুলো তো বেশ, দেখি আর ক-খানা...

গোপা বিস্কুটের টিন খুলে বেশ কয়েকটা বিস্কুট প্লেটে রাখে।

গোপা : চা-টা খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অনুপ : (প্লেটে বিস্কুটের পরিমাণ দেখে) আরে। এত কী হবে?

আর একটু চা ও বিস্কুট খাওয়ার পর বলে—

অনুপ : দেখুন, আপনার গান তো খুবই ভালো, আতিথেয়তাও চমৎকার। কিন্তু আপনার মেজাজটি ভালো নয়।

গোপা : আর আপনার মেজাজটি খুব ভালো...!

অনুপ : (হেসে) আমার মেজাজ খারাপ বলে যে আপনারটাও খারাপ হতে হবে এটা তো একটা যুক্তি হল না।

এমন সময় শিস দিতে দিতে বিভাস ঢোকে।

গোপা : আরে বিভাসবাবু যে। চলুন আমরা ও ঘরে গিয়ে বসি। (এবার অনুপকে বলে—) আমার এক বন্ধু এসেছে, কিছু মনে করবেন না, আমি চললাম।

গোপা বিভাসের কাঁধে হাত দিয়ে প্রায় ঠেলে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিভাস : এইভাবে বেরিয়ে এলেন যে। ও, অনাথ আশ্রমের চাঁদা চাইতে এসেছে বোধহয়। দেখুন তো, কীরকম বাঁচিয়ে দিলাম আপনাকে।

গোপা : অনাথ আশ্রমের চাঁদা বাঁচাবার মতো মহৎ কাজ আপনারা না করলে কে করবে।

একথা বলে তরতর করে ওপরে চলে যায়। বিভাস অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ও আবার গিয়ে শিস দিতে দিতে লাইব্রেরিতে ঢোকে। সিগারেট বার করে অনুপকে অফার করে—

বিভাস : হ্যাভ এ সিগারেট?

অনুপ : না, ধন্যবাদ...

বিভাস : ওয়েল, এক্সকিউজ মি। (সিগারেট ধরায়) লেট মি ইনট্রোডিউজ মাইসেলফ ফার্স্ট। বিভাস চ্যাটার্জী, এ ফ্রেন্ড অফ মিস...হেঁ হেঁ...আই মীন অফ দিস ফ্যামিলি। এই পরিবারের একজন বিশেষ বন্ধু। আপনি?

অনুপ : এ পরিবারের একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী।

বিভাস : ভূতপূর্ব। ইউ মীন 'লেট'।

এইসময় সৌরেন ঘরে ঢোকে। বিভাসকে দেখে বলে—

সৌরেন : আরে বিভাস যে। তুমি কখন এলে। ওকে আমল দেবেন না, কাজকর্ম সব ভেস্তে দেবে।

বিভাস : ওয়েল, এক্সকিউজ মি...

সৌরেন : আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, চলো। হ্যাঁ, ম্যানুস্ক্রিপ্ট আনেননি বুঝি। এ বড়ো অন্যায়। কথা দিয়ে...

অনুপ টেবিলে রাখা ম্যানুস্ক্রিপ্টের তাড়া সৌরেনকে দেয়।

সৌরেন : এনেছেন। তাই ভাবছিলাম, আপনার তো আবার কথার নড়চড় হয় না। লেখাটা কদ্দুর এগোল।

অনুপ : আরো দু-একদিন আসতে হবে মনে হচ্ছে।

সৌরেন : বেশ, আপনার যখন খুশি আসবেন।

বিভাস : দশটা বেজে গেল। চলো চলো।

এবার সৌরেন ও বিভাস ঘর থেকে বেরিয়ে গোপাকে সিঁড়ির কাছে দ্যাখে।

সৌরেন : গোপা, তুই ওপরে যাচ্ছিস। এই খাতাটা আমার ঘরে রেখে দিস তো। দেখিস, যেখানে সেখানে যেন ফেলে রাখিস না। খুব দরকারি কিন্তু। চলো চলো বিভাস, বড়ো দেরি হয়ে গেল।

18th Sequence

গোপা ম্যানুস্ক্রিপ্টটার ওপরের মলাটটা দ্যাখে। লেখা আছে, 'পূর্বাচল': শ্রী অনুপ চৌধুরী। এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ায়। পিছনে শিকলবাঁধা একটি ছবি—ফিমেল ন্যুড। ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে খাটের ওপর বসে ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়তে শুরু করে। Dissolve

গোপা সোফায় বসে উপন্যাসটি পড়ে চলেছে। Dissolve

খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে। ঘরে আলো জ্বালা, রাত হয়ে গেছে। বউদি রমা ঘরে ঢুকে উপন্যাস পাঠরত গোপাকে বলে—

রমা : একী, তুমি এখনো পড়ছ, ধন্যি মেয়ে বাপু। সেই সকাল থেকে বই নিয়ে বসে আছ... কী পড়ছ এত মনোযোগ দিয়ে?

গোপা : ও এমনি একটা বই।

রমা : অরুণাদের ওখানে না তোমার চায়ের নেমন্তন্ন ছিল?

গোপা : (খাট থেকে উঠে) সত্যিই তো! একেবারে মনে ছিল না, ভারি অন্যায় হয়ে গেল।

রমা : কেমন যে তোমাদের মন বুঝি নে বাপু! Fade out

19th Sequence Fade in

পরের দিন লাইব্রেরিতে ঢোকে গোপা। অনুপ এসে টেবিলে বসে বই পড়ছে। গোপা পাশের চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। বলে—

গোপা : আপনার বইটা কাল পড়লাম। ওর মধ্যে 'জয়ার' চরিত্রটি নেহাতই আপনার মনগড়া। ওরকম মেয়ে আমাদের দেশে হয় না।

অনুপ : গল্পের আগাগোড়া সবটাই তো মনগড়া, পড়েছেন শেষ অবধি?

গোপা : পড়েছি, আমি কী বলতে চাই আপনি বুঝেছেন? ওই জয়ার চরিত্রটা নেহাতই অসম্ভব নয় কী? ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে পারে কখনো অমন সব বস্তির মাতালদের মধ্যে রাত বিরেতে ঘুরে বেড়াতে?

অনুপ : অমন মেয়ে হয় না মানলাম, কিন্তু হলে কেমন হয় বা হওয়া উচিত কি না...

গোপা : কাল থেকে সেই কথাই তো ভাবছি।

অনুপ : শুনে সুখী হলাম। আমার গল্পের দুঃখ-দারিদ্র্য, নারী-পুরুষ যে আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে এটা সব চেয়ে বড়ো আশার কথা। আমার বাড়ির বাইরে আপনিই হলেন আমার উপন্যাসের প্রথম পাঠিকা।

গোপা : আমার সৌভাগ্য।

অনুপ : সৌভাগ্য নয়...সে কথা বলতে পারি না।

গোপা : বড়ো দাম্ভিক আপনি।

অনুপ : চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দাম্ভিক হয়। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা অন্তরে। যাক, আপনার গান আবার কবে শোনাচ্ছেন বলুন।

গোপা : রোজই তো আসছেন। হবেখন একদিন।

অনুপ : বাহ্, আপনি যে রীতিমতো প্রসন্ন হয়ে উঠলেন আমার ওপর। ভাবলাম এই বুঝি আসছে একটা কড়া 'জবাব'। আমিও তৈরি হয়েছিলাম তার চেয়েও কড়া কিছু একটা বলার জন্যে।

গোপা : লোককে কড়া কথা বলে আপনি খুব আনন্দ পান, না।

অনুপ : (হেসে) লোককে নয়, বড়োলোককে। যারা নিজের স্বার্থের জন্য অসংখ্য মানুষকে বঞ্চিত করছে। যাক, বইটা কেমন লাগল?

গোপা : আপনার বই-এ দিনমজুরদের যে সব দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন, পড়তে গিয়ে সত্যিই চোখে জল এসে যায়। সত্যি কী তারা এত দুঃস্থভাবে দিন কাটায়?

অনুপ : আশ্চর্য। এত বড়ো সত্যকেও আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। গাড়ি চড়ে লোকে চলে যায়। নর্দমার থেকে মানুষকে কুড়িয়ে খেতে দ্যাখে। একবারও তার মনে প্রশ্ন জাগে না—এটা কী! এ কেন হবে? পথ

চলতে গিয়ে যদি কোনো লোক মাথা ঘুরে পড়ে যায় অমনি চারদিক থেকে লোক ছোটে তাকে ধরে তোলবার জন্যে। কারণ পথ চলতে গিয়ে ওরকমভাবে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে দেখলেও কেউ অবাক হয় না। বিরাট অট্টালিকার মাথায় লেখা রয়েছে 'বাড়ি ভাড়া'। অথচ শীতের রাতে তারই দরজায় কুঁকড়ে পড়ে আছে গৃহহীন। কারুর মনে প্রশ্ন জাগে না। মনে হয় না যে মানুষের সমাজে এও তো হবার কথা নয়।

গোপা চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে অনুপের কথা শুনছে।

অনুপ : (বলে চলে—) অসংখ্য অমানুষিক ব্যাপারকে এত সহজ করে আমরা নিয়েছি। তার জন্যে আজ...ওঃ, রীতিমতো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। যাক, হাতে কাজ রয়েছে, আপাতত থামতে হল।

গোপা : কী বলছিলেন বলুন না।

অনুপ : না থাক, এসব কথা বলা নেহাতই সাময়িক উত্তেজনা। এত বড়ো বাড়িতে বসে এসব গল্প শোনাও এক রকমের বিলাস। ভূতের গল্পের মতো...ভালোও লাগে আর আজগুবিও মনে হয়। একটা চা পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।

গোপা মুখ ম্লান করে চলে যায়। একটি চাকরকে উদ্দেশ্য করে বলে—'লাইব্রেরিতে এক কাপ চা পাঠিয়ে দিয়ো তো।' Background music বাজে। দেখা যায় গোপা চিন্তিতমুখে নিজের ঘরে ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসে। Close-up-এ একটা গয়না। গোপা সেটা অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়ে খোলা গয়নার বাক্সের মধ্যে ফেলে দেয়। Med close shot-এ দেখা যায় বাক্সভরতি গয়না। Fade out

20th Sequence Fade in

গাড়ি এসে থামে সুমিতার বাড়ির সামনে। গাড়ির থেকে সরুপাড় শাদা শাড়ি পরিহিতা গোপা নামে ও ড্রাইভারকে বলে—

গোপা : তুমি এখন যাও, ফেরার পথে আমাকে তুলে নিয়ো।

(Cut to)

সুমিতা জানলা দিয়ে গোপাকে দ্যাখে। দরজা খুলে গোপার পোশাক দেখে অবাক হয়ে বলে—

সুমিতা : একী, এইভাবে বেরিয়ে পড়েছিস?

গোপা : সবসময় সেজে থাকতে হবে বুঝি।

সুমিতা : তুই একটু বোস্ ভাই, আমি চানটা সেরে এক্ষুনি আসছি। ততক্ষণ বই-টইগুলো দ্যাখ্ না।

ওরা অনুপের ঘরে ঢোকে। অনুপ লক্ষ করে না। সুমিতা চলে গেলে গোপা খানিকক্ষণ

টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। পিছনে মার্কসের ছবি। দরজার দিকে পিঠ করে গোপা কোনো একটা বই বা অনুপের কোনো লেখা পড়তে শুরু করে, অনুপের খাটে বোসে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে। অনুপ ঘরে ঢোকে ও গোপাকে পিছন থেকে দেখে সুমিতা ভেবে ভুল করে বলে—

অনুপ : কী রে, কী পড়ছিস এত মন দিয়ে। তোর বন্ধু গোপা আবার চটে গেছে আমার ওপর। আজই প্রথম লক্ষ করে দেখলাম। বেশ লাগল। বুদ্ধিমতী মেয়ে। মনে হল আধুনিকতার হালকা দিকটা ওর পোশাক অবধি গিয়েই আটকে গেছে। ভেতরের মানুষটাকে ছোটো করেনি।

গোপা উঠে ঘুরে অনুপের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। অনুপ অল্প চমকে উঠেই তারপর স্বাভাবিকভাবে বলে—

অনুপ : দেখলেন তো, আমি মানুষটা কত ভালো। পরোক্ষে কারুর নিন্দে করিনে।

গোপা : নিন্দে করতে আপনার আড়াল দরকার হয় না। (গোপার গলায় কিন্তু আর কোনো উষ্মার আভাস নেই।) সেই পরিচয় আমি পেয়েছি। যাক, এদ্দিন পরে, কাল যে অনুগ্রহ করে আমাকে লক্ষ করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ।

অনুপ : তাই বলে কথাগুলো বিশ্বাস করে বসবেন না যেন। ও নেহাতই আপনার বন্ধু সুমিতাকে খুশি করবার জন্য বলা। ও আবার আপনার নিন্দে শুনলে ভয়ানক চটে যায়। যাই বলুন, আপনাকে এই সাধারণ পোশাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। কেন মিছিমিছি চাকচিক্য দিয়ে এই রূপকে ঢেকে রাখেন।

এইসময় সুমিতা ঘরে ঢোকে। গোপা তার খুশি ঢাকতে গিয়ে সুমিতাকে বলে—

গোপা : সুমিতা চা খাব।

সুমিতা : না বাপু, তুমি বাড়িতে গিয়েই চা খেয়ো। আমাদের চা তো রুচবে না। শুধু শুধু কষ্ট পাবে।

অনুপ : কেন। আমাদের চা খারাপ হলো কীসে। (হেসে) ও, বুঝেছি, ভগ্নি আমার ভাবনায় পড়েছে পেয়ালা নিয়ে। একটারও হাতল নেই কিনা। তা কী হয়েছে... যা, নিয়ে আয় চা। পিরিচের ওপর বসিয়ে আনলেই তো হবে। হ্যাঁ, আমার জন্য এক বাটি আনিস।

সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে গোপা বলে—

গোপা : যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা অনুরোধ করব।

অনুপ : যথা।

গোপা : ঠিক করেছি কাল আমাদের ফ্যাক্টরির বস্তিগুলো দেখতে যাব। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে।

অনুপ : হঠাৎ এ আকাঙ্ক্ষা!

গোপা : ধরে নিন এও একটা বিলাস।

অনুপ : কিন্তু আপনাকে দেখে যে ওরা ভয়েই দূরে সরে থাকবে।

গোপা : আমাকে ওখানে কেউ চেনে না।

অনুপ : বেশ, যাব। কিন্তু পোশাকটি যেন আপনার এই ধরনেরই থাকে। একটু আরো সাধারণ হয় তো আরো ভালো।

গোপা : কেন বলুন তো?

অনুপ : জাঁকালো পোশাক পরে ওদের সামনে যাওয়া মানেই অঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষের নোটিশ এঁটে যাওয়া। ওসব পোশাক পরলে ওরা সমীহ যত না করে, তার চেয়ে ঢের বেশি করে অবিশ্বাস।

সুমিতা চা নিয়ে ঢোকে। গোপাকে বলে—

সুমিতা : এই যে চা।

গোপা হাতল ছাড়া চায়ের কাপ কানা ধরে তুলতে গিয়ে হাতে গরম লাগায়, তারপর ছেড়ে দেয়। অনুপ তা দেখে হো হো করে হাসে। তারপর বলে—

অনুপ : বস্তি দেখতে যাওয়ার প্রথম পরীক্ষা।

মেয়েরাও হাসিতে যোগ দ্যায়। Fade out

21st Sequence Fade in

Long Shot-এ বস্তির মধ্য দিয়ে গোপা ও অনুপ এগোচ্ছে। একটা টিউবওয়েলের পাশে জল কাদা। গোপা সাবধানে এগোয়। একটি লোক অনুপকে দেখে এগিয়ে এসে বলে—'নমস্কার বাবু'। অনুপ তাকে বলে—

অনুপ : এই যে অম্বিকা, আরে সেদিন যে বলে গেলাম, সক্কলে মিলে কলের ধার, ড্রেন সব পরিষ্কার করে ফ্যালো, সব তো দেখছি সে রকমই পড়ে আছে।

অম্বিকা : এই আজকেই করব।

অনুপ : মালিকেরা করে দেবে বলে বসে আছ? আরে এতে ক্ষতিটা হচ্ছে কার? তাদের না তোমাদের? আজকেই করিয়ে ফেলো, কেমন।

অম্বিকা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

গোপা-অনুপ আবার হাঁটতে শুরু করে।

গোপা : আপনাকে এখানে সবাই চেনে দেখছি।

অনুপ : চেনাটাই তো স্বাভাবিক।

(Cut to)

শ্রমিক সঙ্ঘের ঘর থেকে হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

একটা লোক : (হুঁকো হাতে) চোখ রাঙিয়ে কাজ আদায় করবে। ওসব চালাকি আমরা ভেঙে দিতে জানি।

দেখা যায় শ্রমিক সঙ্ঘের অপিসে অনেক লোকজন জমায়েত হয়েছে।

দ্বিতীয় : আগে দরখাস্ত।

প্রথম : (যার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল) দরখাস্ত ফরখাস্ত বুঝি না, মেরে শালাকে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় : ম্যানেজার হয়েছে যেন লাট হয়েছে।

দ্বিতীয় : থামব কেন? কেন থামব?

অন্য একজন : ঠিক, জরুর...শালাদের আচ্ছা করে...

সমস্বরে রব ওঠে 'হ্যাঁ জরুর'।

অন্য আরেকজন : মাইনে না বাড়াবি সে আলাদা কথা, তা বলে আমাদের বাপ তুলে গাল দিবি। আমাদের ইজ্জত নেই।

অনুপ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে—

অনুপ : না নেই। মান ইজ্জত সত্যিই যেদিন আদায় করতে পারবে, সেদিন এইভাবে কথা বলার সাহস এবং সুযোগ কোনোটাই ওরা পাবে না। আগে বাঁচার পথটা সাফ করো, তারপরে ইজ্জতের ভাবনা ভেবো।

একজন : কিন্তু দেখুন...

অনুপ : না, কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধালে নিজেদেরই অসুবিধে হবে। তোমরা সব নিজের নিজের বাড়ি যাও।

সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে অনুপ ডেকে নেয়।

অনুপ : তারাপদ, তুমি এসো তো আমার সঙ্গে।

অনুপ, তারাপদ ও গোপা বাইরে গিয়ে একটু হেঁটে এক' জায়গায় একটি বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। ওরা যখন কথা বলে, এক মহিলা বাড়ির বাইরে কাপড় তুলতে এসে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওদের কথা শোনে।

অনুপ : ওরা না বুঝলেও তোমার তো বোঝা উচিত। এই দুর্দিনে যাতে একটা গণ্ডগোল না হয় সেই চেষ্টা করো। আর শ্রমিক সঙ্ঘ যা বলে সেরকম কাজ করে যাও। তা, আজ রবিবার। আগামী রবিবার দিন সমস্ত মাতব্বরদের জুটিয়ে নিয়ে একটা সভার বন্দোবস্ত করো। সন্ধের দিকে কোরো যাতে আমিও আসতে পারি। (এবার গোপাকে লক্ষ করে বলে—) চলুন।

(Cut to)

একটি পথ ধরে ওরা ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। পিছন থেকে ক্যামেরা ওদের অনুসরণ করে Track করছে।

অনুপ : হঠাৎ এত চুপচাপ যে?

গোপা : আমি ভাবছি, আপনি ওদের এত কথা জানলেন কী করে।

অনুপ : আপনার আজকের এই শখ যদি কখনো আগ্রহে দাঁড়ায় তা হলে আপনিও জানতে পারবেন।

গোপা : আপনাদের রবিবারের সভায় আমি থাকব কিন্তু।

অনুপ : কিন্তু সে তো রাত্তিরে হবে।

গোপা : তা হোক।

22nd Sequence

বাড়িতে সুমিতা বিছানায় বসে একটা বই পড়ছিল। অনুপ ঢোকে। অনুপের হাতে একটা বই দেখে সুমিতা আগ্রহের সঙ্গে বলে—

সুমিতা : দেখি দেখি কী বই। (অনুপের হাত থেকে বইটা নিয়ে বলে—) ও। নতুন কোনো বই দেখলেই আমার মনে পড়ে তোমার উপন্যাসের কথা। আমি যে কীভাবে দিন গুনছি দাদা। কবে বেরোবে তার কোনো খোঁজ নিয়েছ?

অনুপ : শুনলাম অনেকদিন হল ছাপাখানায় দেওয়া হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে বেরোবে হয়তো।

গোপা : আমি কিন্তু ছ-কপি চাই। বন্ধুদের সব কথা দিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, কী নাম হল শেষপর্যন্ত?

অনুপ : পূর্ব্বাচল।

(Cut to)

গোপার হাতে একটি বই।

গোপা : পূর্ব্বাচল! (তারপর বই-এর নীচে লেখকের নাম দেখে) সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টেবিলের ওপর অনেক ক-টি বই-এর কপি রাখা রয়েছে। বই ছেপে এসেছে, তবে সৌরেনের নামে। গোপার স্তব্ধ মুখের Close up। Dissolve

23rd Sequence

অনুপের বাড়ির সামনে বাড়িওয়ালার সঙ্গে অনুপ।

বাড়িওয়ালা : না মশাই, আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না। প্রথমে বললেন চাকরি হয়েছে, এখন আবার বলছেন বই ছাপাতে দিয়েছি, বই বেরোলে তবে টাকা দেবো।

গোপার গাড়ি এসে অনুপের বাড়ির সামনে পৌঁছায়। গাড়ির ভেতরে ক্যামেরা জানলা Frame করেছে। দেখা যায় বাইরে, অল্প দূরে, বাড়িওয়ালা ও অনুপের কথোপকথন গাড়ির ভেতরে বসে গোপা শুনছে। এবার গোপা ড্রাইভারকে বলে—

গোপা : এগিয়ে গিয়ে ওই গ্যাস পোস্টটার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াও তো।

বাড়িওয়ালা : (বলে চলেছে) কীরকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? ঝুট বলে আর জ্বালাবেন না মশাই। কালই আমার বাড়ি ছেড়ে দিন। হ্যাঁ...আচ্ছা ভাড়াটে জুটেছে বাবা, জ্বালাতন করে মারলে।

বাড়িওয়ালা রাস্তায় নামে। গোপা অনুপের অলক্ষে গাড়ির ভেতর থেকে তাকে ডাকে।

গোপা : দেখুন...শুনুন...শুনছেন...

বাড়িওয়ালা এদিক ওদিক তাকায়। ভাবে, গোপা বোধহয় রাস্তায় অন্য এক মহিলাকে ডাকছে, তারপর, তাকে ডাকা হচ্ছে বুঝতে পেরে বলে—

বাড়িওয়ালা : আপনি আমাকে বলছেন?...এই আমাকে...

গোপা : হ্যাঁ, শুনুন, আপনি দুশো টাকার একটা রসিদ লিখে রাখবেন, আমি টাকাটা ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়ে দেবো। টাকাটা দিচ্ছি অনুপবাবুর বাড়ি-ভাড়া বাবদ।

বাড়িওয়ালা : কিন্তু আপনি...

গোপা : হ্যাঁ, আমি। আর শুনুন, কথাটা যেন অনুপবাবুকে জানাবেন না। কাউকেই নয়।

বাড়িওয়ালা : তা কি আর বলতে হবে। আপনি অনুরোধ করছেন, তা কি আর না মেনে পারি। হেঁ হেঁ... Dissolve

24th Sequence

হুঁকো হাতে বাড়িওয়ালা ঢোকে অনুপের ঘরে। অনুপ বই পড়ছে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলে—

বাড়িওয়ালা : (একটা চেয়ার দেখিয়ে) এইটে তো বেড়ে করেছেন। কী দরকার মশাই খামোকা কতগুলো চেয়ার বেঞ্চি কিনে পয়সা নষ্ট করবার? হেঁ হেঁ...মশাই আমরাও মানুষ তো। হ্যাঁ, শুনুন অনুপবাবু, সকালবেলায় কতগুলো কর্কশ কথা আপনাকে বলে ফেলেছি মশাই, কিছু মনে করবেন না।

অনুপ : কর্কশই তো আপনি বলে থাকেন। আপনার মুখে মিষ্টি কথা শুনেছিলাম প্রথম যেদিন বাড়ি-ভাড়া দিই আর আজ। প্রথম দিনের কারণটা বুঝতে পারি কিন্তু আজকেরটা তো ঠাহর করতে পারছি না।

বাড়িওয়ালা : (হাসতে থাকেন) আরে মশাই, আমরাও মানুষ তো।

অনুপ : হঠাৎ সেই রকম তো মনে হচ্ছে, অমন চট করে বদলালেন কী করে?

বাড়িওয়ালা : দেখুন অনুপবাবু, লোকটা আপনি মন্দ নন মশাই, কিন্তু কথাবার্তাগুলো কেমন আপনার একটুখানি ইয়ে। ও মশাই...অনুপবাবু...ঘরটা যে কেমন নোংরা হয়ে রয়েছে। বলেন তো আর একবার ভালো করে কলি ফিরিয়ে দিই। ধবধবে ঘরে মনের সাধে যত খুশি লেখাপড়া করুন। হেঁ হেঁ...আপনার মতো লোক কী আর ভাড়া না দিয়ে পালাবেন।... দেবেন, দেবেন, যখন খুশি হয় ভাড়া দেবেন।

অনুপ : দেখুন, আপনার গালাগালি শুনে আমি অভ্যস্ত। তাতে অসম্মান বোধ করি কিন্তু এতটা অস্বস্তি বোধ করি না। ক্রমে ভীত হয়ে উঠছি। ব্যাপারটা কী বলুন তো!

বাড়িওয়ালা : ওরে বাবা। ও অনুরোধটি আমায় করবেন না মশাই। ওটি আমি কিছুতেই বলতে পারব না। বিশেষ করে তিনি আবার আপনাকে বলতে মানা করেছেন। জানেন তো...(বাড়িওয়ালা হুঁকোতে টান মারতে মারতে রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকেন—)...স্ত্রীলোকের অনুরোধ না রাখা, সেটা কি ভদ্রলোকের কাজ হবে?

অনুপ : কী বলছেন আপনি...খুলে বলুন।

বাড়িওয়ালা : তা...তা আপনাকে বলছি, কিন্তু আপনার পেটে কি কথা থাকবে? আপনি হয়তো সবাইকে বলে দেবেন। কিন্তু কথাটা যদি আপনি নাই জানলেন তাহলে আপনার উপকারটাই বা করা হল কী করে। এই যে মশাই...ওই যে সুন্দরী মেয়ে, কী বিরাট গাড়ি তাঁর। মাঝে মাঝে আপনার এখানে আসেন। বোধহয় আপনার কোনো আত্মীয়া...কিংবা হেঁ হেঁ...মানে বান্ধবী-টান্ধবী হবে আর কী। তিনি ভাড়া বাবদ আমাকে দুশো টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে গেলেন আর বলে গেলেন ভাড়ার জন্য যেন আপনাকে বিরক্ত না করি।

অনুপ : সে টাকা আপনি নিলেন কেন। যান, এক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।

বাড়িওয়ালা : সে কী! টাকা ফিরিয়ে দেবো। আপনি কী বলছেন? আপনার মাথা খারাপ নাকি? আর আমি কি ওদের বাড়ি চিনি?

অনুপ : বেশ, চলুন আমার সঙ্গে।

বাড়িওয়ালা : আরে, মারবেন নাকি? আপনারা খদ্দর-টদ্দর পরেন। আপনারা সব করতে পারেন। ও মশাই, আপনি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। ও সবের গোলযোগের মধ্যে আমি নেই মশাই।

অনুপ : (পাঞ্জাবি পরতে পরতে ডাকে—) সুমিতা।

নেপথ্য থেকে সুমিতা উত্তর দেয়—'যাই দাদা'।

অনুপ : দ্যাখ্ গোপার কাণ্ড, আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়িভাড়া সে চুকিয়ে দিয়ে গেছে। দান করার স্পর্ধা তার কী করে হল, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি তার কাছে। সে টাকা তাকে ফিরিয়ে নিতেই হবে।

25th Sequence

গোপার বাড়িতে লাইব্রেরির পরদা সরিয়ে অনুপ ঢুকে কিছুটা উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে—

অনুপ : আমি জানতে এসেছি আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়িভাড়া...

তারপর নিরুত্তর গোপার ম্লান মুখ দেখে থমকে থেমে যায়। গোপা অনুপকে 'পূর্বাচল'-এর কপিটি দেখায়। বইটির ওপর গোপার দাদা সৌরেন-এর নাম ছাপা।

গোপা : বাড়িভাড়ার লক্ষগুণ দিলেও এ ঋণ পরিশোধ হয় না অনুপবাবু। আপনার এত বড়ো একটা সৃষ্টি এতখানি খ্যাতি ছিনিয়ে নেবে শুধু টাকার জোরে। অসম্ভব। এ আপনি প্রকাশ করে দিন।

Track in on big close up। গোপাকে কাঁদতে দেখা যায়।

অনুপ : (খানিকক্ষণ চুপ করে নিজেকে সামলে নিয়ে) আপনার দাদার ব্যবহারে আমি মোটেই অবাক হইনি। অবাক হচ্ছি আপনার এই দুঃখ দেখে। কিন্তু আমার ক্ষতিতে আপনি যে এতটা ব্যথিত ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে।

গোপা : আনন্দের কথা এখন থাক অনুপবাবু। বাড়িভাড়ার টাকা দিয়েছি বলে যেমন

আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে ছুটে এসেছেন, তার দ্বিগুণ উত্তেজনা নিয়ে একবার দাদার সাথে দেখা করুন। এই আমার অনুরোধ।

অনুপ : হয়তো তাই যেতাম। কিন্তু থাক। এর পরে আর কোনো কিছু নিয়েই আপনার দাদার সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছে আমার নেই। এখন আমি আসি গোপা দেবী।

অনুপ ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে যায়। পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে হাসির হুল্লোড়।

(Cut to)

পাশের ঘরে সৌরেনের বই বেরোনো উপলক্ষে সবাই জমায়েত হয়েছে। সৌরেন স্যুট (থ্রি পিস) পরে।

বিভাস : থ্রি চিয়ার্স ফর দ্য অথর, হিপ হিপ হুররে, হুররে!

সৌরেন : হয়েছে হয়েছে। আপনারা বসুন।

এক ভদ্রলোক : আশ্চর্য। আপনি এত ভালো লিখতে পারেন তা তো জানতুম না। আপনি তো একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক।

আর একজন : স্ট্রেঞ্জ! দিনমজুরদের দুঃখ দৈন্যের ইতিহাস আপনি এত গভীরভাবে জানলেন কী করে? অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি বলতে হবে। আপনার এই বই, শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

সৌরেন : কী যে বলেন আপনারা। থাক থাক, ওরকম করে বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

দ্বিতীয় জন : লজ্জা! এ তো গৌরবের কথা। ইন ফ্যাক্ট আপনার সাথে পরিচয় আছে বলে আমরা নিজেরাই গৌরব অনুভব...

দ্বিতীয়জনের কথার মাঝখানে স্যুট ও টাই পরা বিভাস ঘরে ঢুকে বলে—

বিভাস : হ্যালো সৌরেনদা, কনগ্র্যাচুলেশন, আই মীন অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি তো সোজা লোক নও। তলে তলে এত? এ টাইগার ইন এ শিপ'স স্কিন?

সৌরেন : বোসো বোসো বিভাস। ওসব কথা এখন থাক।

রমা : (সৌরেনকে) তুমি অমন করছ কেন বলো তো ?

অন্য মহিলা : বুঝতে পারছ না, এ হল বিনয়, যাকে বলে মডেস্টি।

বিভাস : তোমার কিন্তু এ অকেশনটা সেলিব্রেট করা উচিত সৌরেনদা।

গোপা ঘরের অন্য এক ধারে চুপ করে বসে থাকে।

বিভাস : খুব বড়ো রকমের ব্যাপার তো একদিন একটা হবেই। আজকের জন্য আমি একটা সাজেশন দিচ্ছি।

সবাই : বেশ বেশ বলুন বলুন।

বিভাস টপ করে একটা ডিভান-এর উপর জুতো সমেত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিভাস : আমি প্রস্তাব করছি যে অদ্যকার এই শুভ সন্ধ্যায়, উইথ লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন প্রেজেন্ট, সৌরেনদার উচিত কোনো এক বৃহৎ স্থানে, আই মীন হোটেল গমনপূর্বক...এন্টারটেইন অল অফ আস টু সামচ্যুয়াস ডিনার।

সবাই : হিয়ার হিয়ার।

এক ভদ্রলোক : সর্বান্তঃকরণে আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

সবাই হাসতে হাসতে উঠে পড়ে।

বিভাস : (সবাইকে) উঠুন উঠুন চলুন। (তারপর গোপাকে দেখতে পেয়ে বলে—) মিস ব্যানার্জী, চুপচাপ বসে যে? কই আপনি কিছু বলছেন না তো!

গোপা : আপনারাই তো বলছেন।

বিভাস : যাক, এখন দয়া করে উঠুন দেখি, উঠুন।

গোপা : না, আমি আর এখন যাব না। আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।

বিভাস : মিস ব্যানার্জীর এই 'বিশেষ কাজ' শুনে শুনে...নাঃ, আজ আর আপনার কোনো অজুহাত শুনব না। আজ আপনাকে যেতেই হবে...চলুন।

গোপা : মাপ করবেন বিভাসবাবু, আমার এক বন্ধুকে কথা দিয়েছি, আমাকে যেতেই হবে সেখানে।

সৌরেন : আঃ, থাক না বিভাস। ও যখন যেতে চাইছে না...

সবাই দারুণ হইহই করতে করতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। গোপা একা বসে থাকে মাথায় হাত দিয়ে।

26th Sequence

অনুপ, সুমিতা ও তার মা। মা সুমিতার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সুমিতা কাঁদছে।

মা : তুই মন খারাপ করিস না সুমিতা। ওর বিদ্যে তো কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। আমার অনুপ বেঁচে থাক । অমন বই ও ঢের লিখতে পারবে।

সুমিতা : আমি ভাবতেই পারছি না মা। মানুষ এতখানি নীচ কী করে হতে পারে। না দাদা, তুমি কাগজে কাগজে প্রকাশ করে দাও এ লেখা তোমার। এ কী জুলুম। বড়োলোক বলে যা খুশি তাই করবে?

অনুপ : প্রকাশ করা সহজ কিন্তু প্রমাণ করা কঠিন। তুই দুঃখ করিসনে সুমিতা। (ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে। ঘণ্টাধ্বনি শুনে অনুপ বলে—) ওঃ, আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে।

মা : তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?

অনুপ : একটু কাজ আছে। Dissolve

27th Sequence

রাস্তায় অনুপ দাঁড়িয়ে গোপার অপেক্ষায়। একটু পরে গোপা এসে যোগ দেয়।

অনুপ : আপনি সত্যিই এলেন তাহলে! মনে হচ্ছিল শেষপর্যন্ত হয়তো আসা আপনার হয়ে উঠবে না।

গোপা : এরকম মনে হওয়ার কারণ?

অনুপ : না এমনি।

গোপা : বইটার কথা সুমিতা জানতে পেরেছে? ছিঃ, ওর কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?

অনুপ : সুমিতা আপনাকে জানে গোপা দেবী। চলুন আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ওরা হাঁটতে শুরু করে। বস্তির ভিতর দিয়ে ওরা অগ্রসর হয়।

(Cut to)

হোটেল হিন্দুস্থান-এর বাইরে সৌরেনদের দলও হুল্লোড় করতে করতে এগোচ্ছে।

(Cut to)

শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসের ভিতর জমায়েত হয়েছে সবাই। ঘরের দেয়ালে হলিউড-এর সব হিরোইনদের কাটা-ছবি সাঁটা রয়েছে। একটা টেবিলের ওপর বোতলে রজনীগন্ধাও রাখা রয়েছে।

কালীপদ : না বাপু, এ কেমন বিচার হল? ম্যানেজারবাবুর সেদিনকার ব্যাপারটা...

তারাপদ : তোমার সেই একই কথা কালীদা। এখন ওসব কথা থাক। সবার আগে হোক মাইনের কথা।

একটি মুসলমান লোক : ঠিক, জরুর। বাবুকে ভালো করে গুছিয়ে বলো না তারাপদ। জান দিয়ে খাটব, আর মাসের মধ্যে পনেরো দিন ভুখা থাকতে হবে?

একটি গরিব স্ত্রীলোক একটি ছোটো ছেলেকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে ও মারতে থাকে।

স্ত্রীলোক : হারামজাদা। বজ্জাত। তোর মরণ হয় না। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। এই তো তোমরা মাতব্বররা সবাই এখানে আছ। তোমরা বিচার করো তো, বাবুদের বাড়ি থেকে কত করে চেয়েচিন্তে আমার কচি মেয়েটার জন্য একটু ফ্যান এনে রেখেছি। মেয়েটা আমার ওইটুকুন খেয়েই রাত কাটায়। যেই আমি বাইরে গেছি, কোত্থেকে এই হারামজাদা ছেলেটা এসে ফ্যানটুকু সব খেয়ে ফেলেছে। পাজি নচ্ছার।

গোপা : আহা, মেরো না। (মার খেয়ে ছেলেটি কাঁদতে শুরু করে।)

স্ত্রীলোক : না, মারবে না। পাজি ছুঁচো...আদর করবে।

কালীপদ : এ যে আমাদের গোকুল মিস্ত্রির ছেলে। কীরে, চুরি করে খাচ্ছিলি কেন রে?

ছেলেটি : (কাঁদতে কাঁদতে) খুব খিদে পেয়েছে। দু-দিন কিছু খাইনি।

(Cut to)

হোটেল হিন্দুস্থান-এর এক ঘরে লম্বা টেবিলের চারিদিকে সৌরেনের দল, টেবিলে খাবারের প্রাচুর্য। সবাইয়েরই মুখে প্রায় পৈশাচিক হাসি। রমা বেয়ারাকে হেঁকে বলে—

রমা : নিয়ে যাও।

Camera track back করে রমা ও বিভাসের ওপর আসে।

বিভাস : আর একটু খান না।

রমা : অনেক খেয়েছি, আর পারব না।

(Cut to)

শ্রমিক সঙ্ঘের ঘরের বাইরে গোপা ছেলেটিকে কিছু টাকা দিয়ে বলে—

গোপা : যা বাড়ি যা, আর কখনো চুরি করে খাবি না।

স্ত্রীলোক : যা ছোঁড়া। খুব বেঁচে গেলি। ফের যদি আমার ঘরে ঢুকিস তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।

গোপা স্ত্রীলোকটিকেও টাকা দিয়ে বলে—

গোপা : তোমার মেয়েকে দুধ কিনে দিয়ো।

গোপা এবার আবার ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে বসে।

কালীপদ : আমার একটা কথা বলবার আছে। বর্ষার আগে আমাদের ঘরগুলো মেরামত করে দিতে হবে।

অনুপ : সব একসঙ্গে চাইলে কিছুই পাবে না। আপাতত এই তিনটে দাবি নিয়েই ভাবা যাক না। (গোপার দিকে তাকিয়ে) আপনি কী বলেন?

গোপা : বেশ তো।

অনুপ : তাহলে তারাপদ তুমি আর দেরি কোরো না। তুমি আগামী রবিবারই একটা সাধারণ সভার ব্যবস্থা করো। সেখানে সকলের সম্মতি নিয়ে, আমি নিজে তোমাদের হয়ে মালিকের কাছে দাবি পেশ করব।

তারাপদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

অনুপ : আচ্ছা আজকে তাহলে ওঠা যাক।

অনুপ ও গোপা বেরিয়ে যায়। বেরোবার আগে গোপা বোতলে রাখা রজনীগন্ধা ছিঁড়ে নিয়ে মাথায় গোঁজে।

(Cut to)

রাত হয়ে গেছে। চাঁদনি রাত। গোপা ও অনুপ হাঁটছে ঘাসের মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়ে।

অনুপ : প্রকাশ্য সভায় কিন্তু আপনার উপস্থিত থাকা উচিত হবে না।

গোপা : (উত্তর না দিয়ে) বাহ্, চমৎকার জোছনা উঠেছে।

অনুপ : এইটুকু আলো না থাকলে পথ চলাই মুশকিল হত।

গোপা : অমন চাঁদের আলো দেখে আপনার মতো একজন সাহিত্যিকের শুধু পথ-চলার কথাটাই মনে হল।

অনুপ : (হেসে) কী করি বলুন। এমন যুগে জন্মেছি আমরা যে মাটির মানুষ ছেড়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকাবার অবসর কোথায়?

ওরা হাঁটতে থাকে। গোপা হোঁচট খেয়ে পড়বার উপক্রম হলে অনুপ ধরে ফেলে।

অনুপ : পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবেন দেখছি।

গোপা : ধরবার লোক থাকলে সামনে পড়তে ভয় কী? আর ভাঙলেই বা... বড়োলোকের হাত পা ভাঙলে তো আপনি খুশিই হন।

অনুপ : কারুর হাত পা ভাঙলে আমি খুশি হই? না। তা হই না। আর তা ছাড়া আপনি আঘাত পেলে তো রীতিমতো দুঃখিত হব।

গোপা : সে আপনার দয়া।

অনুপ : দয়া...হবে।

গোপা অন্যদিকে একটা পথ বেঁকে গেছে দেখে সেই পথ ধরে।

অনুপ : এ কী। এদিকে কোথায় চললেন?

গোপা : যেদিকে দু-চোখ যায়।

অনুপ : সেটা কি পেরে উঠবেন? চোখ তো আকাশ জল সবকিছুর ওপর দিয়েই চলতে পারে। কিন্তু হতভাগা পা-দুটি কি তা পেরে উঠবে?

দু-জনে হেসে ওঠে।

গোপা : এদিকটা ভারি সুন্দর, আসুন না। (গোপা দৌড়ে অন্য পথ ধরে। ওরা একটা পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ায়। গোপা পুকুরে একটি ঢিল ছুঁড়ে বলে—) কুয়াশা মেশানো আলোতে জায়গাটা কীরকম চমৎকার দেখাচ্ছে। আসুন একটু বসি।

অনুপ : বেশ তো ।

গোপা গা এলিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে পুকুরের খুব কাছে বসে। অনুপ একটু দূরে বসে কাশ ফুল ছেঁড়ে। কিছুক্ষণ দু-জনে চুপচাপ।

অনুপ : সময় এবং স্থান দুটোই কিন্তু গানের পক্ষে চমৎকার। একদিন কিন্তু কথা দিয়েছিলেন গান শোনাবেন।

গোপা : মাটির মানুষ ছেড়ে আকাশের চাঁদের দিকে চোখ পড়ল নাকি? বেশ শুনুন—

গোপা উঠে বসে গান ধরে। Profile-এ দেখা যায় মাথায় গোঁজা রজনীগন্ধা।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো॥
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপা : কই, কেমন লাগল বললেন না তো?

অনুপ : সে কথা তো প্রথমদিন শুনেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলাম। শুধু আমার প্রশংসা শোনার মতো অবসর সেদিন আপনার ছিল না।

গোপা : তা ছিল না, তখন যে আমি বড়োলোক। বড়ো মানুষ।

অনুপ : আর আজ?

গোপা : আজ...আজ শুধু 'মানুষ'।

অনুপ : খুশি হলাম। দু-জগতের মানুষ আমরা। যার যার পথে চলতে গিয়ে একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেই হবে। তবু আপনার আজকের এই কথাটি আমার চিরদিন মনে থাকবে।

গোপা : শুধু কথাটাই মনে থাকবে। যাক, কথাটাকে যে অন্তত দয়া করে মনে রাখবেন সেজন্যে ধন্যবাদ। রাত অনেক হলো। চলুন ওঠা যাক।

অনুপ : চলুন। Dissolve

28th Sequence

বাড়ির দোতলায় সৌরেন পায়চারি করছে গোপার অপেক্ষায়। গোপা কিছু না বলে নিজের ঘরে ঢুকতে যায়।

সৌরেন : শোনো, এত রাত হল যে? এই পোশাকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল? কোনো ভদ্রসমাজে নয় নিশ্চয়।

গোপা : না।

গোপা এবার নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সৌরেন নিজের ঘরে গিয়ে সোফায় বসে। খাটে রমা বোসে। পাশে বেবি কট-এ মশারি ফেলা।

সৌরেন : এই এত রাত্তিরে তিনি বাড়ি ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গিয়েছিলি', তার কোনো জবাবই তিনি দিলেন না।

রমা : তোমাকে আমি আগেই বলেছি, এ মেয়ের চালচলন আমার মোটেই সুবিধের লাগছে না। এসব কথা বললে তো তুমি হেসেই উড়িয়ে দাও। আজ বিভাসও কত কথা বলল।

সৌরেন : হুঁ। এদিকে এই, ওদিকে আবার অপিসে শুনলাম যে মিল-এও নাকি কী একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। নানা ঝঞ্ঝাট এসে জুটছে, কী যে করি!

রমা : আমি বলি কী, তুমি বাবাকে একবার আসবার জন্য তার করে দাও। তিনি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সৌরেন : দ্যাখো, যা বোঝো না, তার মধ্যে কথা বলতে এসো না। বলে বসলে যে বাবাকে তার করে দাও। বাবা এসে যখন বলবেন যে আমারই মিস-ম্যানেজমেন্ট-এর জন্য এসব হয়েছে তখন আমি তার কী উত্তর দেবো শুনি।...(উঠে পায়চারি করতে করতে)...আর তা না করেই বা উপায় কী।

মিল যদিও বা সামলানো যায় এই বিচ্ছু মেয়েকে সামলানো আমার কম্মো না। নাঃ, কালকেই বাবাকে আসবার জন্য একটা Wire করব।

Dissolve

29th Sequence

সৌরেন অফিসে পায়চারি করছে। ম্যানেজার মাথা হেঁট করে বসে। অফিসে একসারি লোক; গরিব, মিলের কর্মচারী, সবাই দাঁড়িয়ে। সৌরেন তাদের সঙ্গে কথা বলছে।

সৌরেন : ধর্মঘট। দাবি। বড়ো বড়ো সব কথা শিখেছ। দল পাকিয়ে কানাকড়িও আদায় করতে পারবে না। না পোষায় তো ক্লিয়ার হও...ভাগো...নেই মাংতা। (ঘরে উপস্থিত অফিসের ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারীদের লক্ষ করে বলে—) আর আপনারা...কী ম্যানেজ করেন, তা আপনারাই জানেন। হোপলেস। আমি হেড অফিস-এ বসে যে খবরটুকু রাখি তা পর্যন্ত আপনারা রাখেন না। (এবার ওয়ার্কারদের দিকে ফিরে) হ্যাঁ, যা জিজ্ঞেস করছিলাম বলো। কে তোমাদের পেছন থেকে ওসকাচ্ছে? (একজন একজন করে সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়) কী চুপ করে রইলে যে?

একটি শ্রমিক : হুজুর মাই বাপ।

সৌরেন : (ধমক দিয়ে) চুপ। ফের বাজে কথা। (আর একজনের সামনে এসে বলে—) কী, তুমি কী বলো? বলো, এইসব গণ্ডগোল কে বাধাচ্ছে? (একেবারে শেষে একটি লোক ট্যারা-চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। তাকে আগে আমরা বস্তিতে দেখেছি সৌরেনের সঙ্গে, নাম অম্বিকা। তাকে এবার বলে—) তুমি বলো।

অম্বিকা : আপনি তো সবই জানেন স্যার। এই অনুপবাবু...

সৌরেন : কে? অনুপবাবু?

অম্বিকা : আজ্ঞে হ্যাঁ, অনুপবাবু।

সৌরেন : (একটু চুপ করে) তিনি এবার তোমাদের ওখানে গিয়ে জুটেছেন বুঝি? আচ্ছা তোমরা এখন যেতে পারো। (এবার ম্যানেজারকে বলে—) আপনিও যান। মোস্ট ইনএফিশিয়েন্ট।

অম্বিকা নামে যে লোকটি অনুপের নাম বলেছে সে ইতস্তত করে সবার শেষে বেরোচ্ছিল।

সৌরেন : (অম্বিকাকে ডাকে) তুমি যেয়ো না। শোনো। Dissolve

(Cut to)

একটু পরে সেই একই ঘরের দৃশ্য।

সৌরেন : মিটিং বললে কবে? রবিবার?

অম্বিকা : আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

সৌরেন একগুচ্ছ টাকা বার করে অম্বিকাকে দেয়। বলে—

সৌরেন : এই নাও টাকা। দরকার হলে আরো দেবো। বেশ বেছে বেছে লোক ঠিক রাখবে। বাইরের থেকেও দু-চার জন আনতে পারো। আর হ্যাঁ, শোনো, মিটিং শুরু হলে আমাকে ফোন করতে ভুলো না।

অম্বিকা : একটু মনে রাখবেন স্যার।

সৌরেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে...যাও।

30th Sequence

Low angle tilted shot. পাহাড়ের মতো উঁচু রাস্তা বেয়ে মিছিল চলেছে। সমবেত কণ্ঠে গান হচ্ছে—

চলো বীর, চলো বীর, চলো বীর।
উদয়ের পথে যেথা
শেষ হবে রজনীর॥
জ্বালো আলো, ঘুচাও রাতের কালো,
আনো তব জাগরণে
জাগরণ পৃথিবীর॥
ধনিকের বণিকের নিষ্ঠুর বন্ধন,
ভেঙে ফ্যালো থেমে যাক মানুষের ক্রন্দন;
আকাশে উড়ুক তব সাম্য পতাকা নব,
স্বার্থের পরাজয়ে জয় হোক শান্তির॥

—শৈলেন রায়

নানা দিক থেকে একটি মাঠে মিছিল জমছে। একটি দলের ব্যানার-এ লেখা 'মিল-ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'। আস্তে আস্তে বিশাল জনতার সমাবেশে মাঠটি ভরে ওঠে। গান্ধী টুপি পরে অনুপ ঢোকে অন্য মাতব্বরদের সঙ্গে। এক কোণে সৌরেনের সেই ইনফরমার অম্বিকা ও কিছু গুণ্ডার জটলা। একটি লোক একটা ঢিল তোলে অনুপকে মারতে।

অম্বিকা : আরে দাঁড়া দাঁড়া, এখন নয়। গোলমাল বাধাক তারপরে মারিস। শোন্, তোরা সব একসাথে থাকিস না, দু-জন দু-জন করে ঘাঁটি আগলা। কেমন?

গুণ্ডারা এবার জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে একজন একজন করে পজিশন নেয়। অম্বিকা এবার একটা ফোন বুথে ঢুকে সৌরেনকে ফোন করে। সৌরেনের বাড়িতে ফোন বাজে। সৌরেন ফোন তুলে বলে—

সৌরেন : হ্যালো, কে অম্বিকা? (অম্বিকা উত্তর দেয়—'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি।' সৌরেন বলে—) বলো। সভা শুরু হয়েছে? অনুপবাবু এসেছে?

পিছন থেকে পরদা সরিয়ে গোপা বেরিয়ে অনুপের নাম শুনে গোপনে চুপ করে এদের বাক্যালাপ শুনতে থাকে।

সৌরেন : হুঁ, তোমার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো? অম্বিকা, শোনো, গুরুতরভাবে জখম-টখম যেন না হয়। এমন কিছু করবে যাতে ওখানে দল পাকাতে যেন আর সাহস না পায়। হ্যাঁ হ্যাঁ...না। আচ্ছা আচ্ছা, অফিসে দেখা কোরো।

গোপা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। সৌরেন গাড়ির শব্দ শুনে বাইরে তাকিয়ে গোপাকে দ্যাখে। Parallel Cutting between মিছিল ও গোপার গাড়ি। মিটিং শুরু হয় ও অনুপ তার বক্তৃতা শুরু করে—

অনুপ : বন্ধুগণ, ভাইগণ। আজ কেন আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, কী আমাদের প্রয়োজন এবং অভাব অভিযোগ, সেই কথাটাই আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে চাই। অবশ্য এ কথাও সত্যি যে আমাদের যা বক্তব্য তা যুক্তি তর্কো দিয়ে বুঝিয়ে বলবার নয়। আজ তোমাদের জানতে হবে কীসে তোমাদের মঙ্গল এবং কীসে নয়।

গুণ্ডারাও এবার আস্তে আস্তে প্রস্তুত হতে থাকে গণ্ডগোল বাধাবার জন্য।

অনুপ : আজ তাই আমাদের মজদুর ভাইদের চোখ চেয়ে দেখতে বলি কোন পথে তারা চলেছে।

গোপার গাড়ি দ্রুত মিছিলের দিকে আসছে, গুণ্ডারা ঠেলাঠেলি শুরু করছে, কেউ কেউ ঢিল তুলে নিচ্ছে।

অনুপ : দাঙ্গা বাধানো সহজ কিন্তু তাতে শ্রমিক সঙ্ঘের কতটা উপকার হবে সেইটে ভেবে দেখা উচিত। আমি বলতে চাই...আমি বলতে চাই...

গুণ্ডারা কিছু শ্রোতা-মজদুরের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে। অনুপ হল্লা ছাপিয়ে চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে চলে—

অনুপ : আমি বলতে চাই...

একটা গুণ্ডা ঢিল তুলে অনুপের দিকে তাক করে। গোপার গাড়ি ছুটছে। ঢিল এসে লাগে অনুপের মাথায়। গোপার গাড়ি এসে থামে ও গোপা ভিড় ঠেলে 'অনুপবাবু', 'অনুপবাবু' বলে চিৎকার করতে করতে এগোতে থাকে। অবশেষে ডায়াসের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। অনুপের কপালে চোট লেগে রক্ত ঝরে পড়ছে। কিছু লোক ওকে সাহায্য করছে। গোপা অনুপের কাছে পৌঁছে যায়। রুমাল বার করে রক্ত পোঁছে।

অনুপ : আপনি? আপনার তো আসবার কথা ছিল না। গোলমাল শুরু হয়েছে, আপনি বাড়ি ফিরে যান।

গোপা : (উত্তেজিত হয়ে) না না, আমি যাব না।

অম্বিকা এসে সবাইকে বলে—

অম্বিকা : এখানে এত ভিড় করেছিস কেন? কই দেখি দেখি। বড্ড লেগেছে কী? শালাদের দেখাব মজাটা। আচ্ছা আমি ওদিকে যাই, দেখি।

এই কথা বলে অম্বিকা বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে জল আসে, গোপা জল দিয়ে অনুপের কপাল মুছে দেয়।

গোপা : এই লাঞ্ছনা আপনি ভোগ করছেন কাদের জন্য? যাদের আপনি ভালো করতে চান তারাই আপনার ক্ষতি করছে। টাকার লোভে জঘন্য কাজ যারা করতে পারে তারা মানুষ না পশু?

অনুপ : পশু...পশু তো বটেই। মানুষ হবার সব রাস্তা যাদের সামনে বন্ধ তারা পশু হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

সৌরেন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মাথায় শোলার টুপি। গোপার হাত ধরে টেনে বলে—

সৌরেন : চলো, বাবা অপেক্ষা করছেন বাড়িতে তোমার জন্য।

গোপা : বাবা! বাবা এসেছেন?

সৌরেন : হ্যাঁ, বাড়ি চলো।

গোপাকে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যায়। Dissolve

31st Sequence

বিরাট বড়ো মায়ের ছবি টাঙানো দেয়ালে। গোপা ছবির নীচে Left of frame-এ বোসে। Right of frame-এ বাবা, ক্যামেরার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে।

গোপা : না দাদা, অন্যায় আমি করিনি, সবই তুমি অন্যের মুখে শুনছ। আমারও তো কিছু বলবার থাকতে পারে।

বাবা : না, পারে না। যে অপরাধ তুমি করেছ, তার ক্ষমা নেই। (ক্যামেরার দিকে মুখ ফিরিয়ে) আমার মেয়ে হয়ে অমন যা তা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতে পারো, এ ছিল আমার ধারণার অতীত। আভিজাত্য জ্ঞানটুকুও জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছ। তা ছাড়া এ গরিবদের সেবা-টেবা, এ তোমার কাজ নয়। আচ্ছা যাও। (আবার ডেকে) আর শোনো। এর পর তুমি আর বাড়ির বাইরে যাও এ আমার ইচ্ছে নয়।

32nd Sequence

খবরের কাগজ ছাপা হচ্ছে। *আনন্দবাজার পত্রিকা*। হেড-লাইন 'গণ-আন্দোলনে কুমারী গোপা। শ্রমিক সভায় মালিকের কন্যা।' সাইকেল করে সে কাগজ কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি হচ্ছে। দ্রুতগতির Background music বাজতে শুরু করে। ভেন্ডাররা চেঁচাচ্ছে 'জোর খবর। জোর খবর। শ্রমিকসভায় গণ্ডগোল। শ্রমিকের নেতার পাশে বড়োলোকের মেয়ে।'

সৌরেনদের বসবার ঘরে জড়ো হয়েছে বিভাস, রিনি ও তাদের অন্য কিছু বন্ধুবান্ধব। গোপাও বসে।

সৌরেন : লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে, তোর জন্য লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা গেছে।

বিভাস : লোকে যে কত কথা রটাচ্ছে তার আর অন্ত নেই। রীতিমতো এক-একজনের মুখে...

রমা : আমি আগেই জানতাম তুমি একটা কিছু কেলেঙ্কারি করবে। ছিঃ ছিঃ, সকলের মুখ হাসিয়েছ। কত বড়ো ঘরের মেয়ে তুমি। তোমার কী মানায় একটা বাজে ছোকরার সাথে মিশে পথে-ঘাটে হইচই করা?

সৌরেন : তা ছাড়া ওসব ছোটোলোক, জানোয়ার; জুতোর ঠোক্কর মেরে যাদের চালাতে হয় তাদের আবার...

এইসময় বাবার জুতোর শব্দ শোনা যায়। উনি ঘরে ঢুকলে সবাই উঠে দাঁড়ায়।

বাবা : বোসো তোমরা। কী বিভাস, তোমার বাবার শরীর ভালো আছে?

বিভাস : আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা : গোপা, ওপরে গিয়ে আমার স্যুটকেস থেকে জিনিসপত্তরগুলো বার করে আলমারিতে তুলে রাখো তো। (এবার অন্যদের দিকে ঘুরে) তারপর তোমাদের সব খবর ভালো? আচ্ছা বোসো তোমরা। Dissolve

Fade in

একটু পরে।

সৌরেন ও তার বাবা।

বাবা : আমার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমারই বাড়িতে বসে বাইরের লোকে আলোচনা করে এ আমার ইচ্ছে নয়। আর শোনো, কাল তো অপিস ছুটি। কাল অপিসে সেই ছেলেটিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

সৌরেন : কাকে...অনুপকে ?

বাবা : হ্যাঁ।

সৌরেন : কিন্তু সে যদি...

বাবা : তা আসবে। লিখে দিয়ো তাদের অভিযোগগুলো আমি শুনতে চাই। প্রতিকার সম্বন্ধে বিবেচনা করার ইচ্ছে আছে।

সৌরেন : তাতে কী কিছুটা প্রশ্রয়...

বাবা : যা বলছি তাই করো। Dissolve

33rd Sequence

অফিসে সৌরেন ও তার বাবা। দু-জনেই স্যুট-টাই পরে। অনুপ ঢোকে গান্ধী টুপি পরে। কপালে ক্ষতচিহ্ন। দু-জনে বোসে, অনুপ দাঁড়িয়ে।

বাবা : আপনাদের...তোমাদের অভিযোগ কী?

অনুপ : তুমি নয় আপনি বলুন।

সৌরেন : বয়সে উনি আপনার চেয়ে প্রবীণ।

অনুপ : বয়সের দাবিতে বলছেন না সেখানেই আমার আপত্তি।

বাবা : শোনো। কী কী সুবিধা তোমরা চেয়েছ সে আমি জানি। আমি অনুমোদনও করব সব ক-টা। কিন্তু সে তোমাদের ধর্মঘটের ভয়ে নয়। আমার মাইনে

করা চাকরদের কী করে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে আমার মেয়ের নাম এবং আমার পরিবারের সম্মান। একে আর বাড়তে দেওয়া যায় না।

অনুপ : কেন মেনে নিয়েছেন সে কারণ জানানো নিষ্প্রয়োজন।

বাবা : জানাবার প্রয়োজন আছে। কারণ তার জন্য দায়ী আপনি। একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়ে তার কতটা ক্ষতি আপনি করেছেন আপনি বুঝবেন না। অবিশ্যি গোপা এখন তার ভুল বুঝতে পেরেছে। আপনার অনুরোধে পড়ে যা করেছে তার জন্য সে দুঃখিত, অনুতপ্ত।

অনুপ : (ম্লান মুখে) তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন?

সৌরেন : তা পারবে না, হঠাৎ একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে।

অনুপ : (স্বাভাবিকভাবে) তবে আর অত ভাবছেন কেন?

সৌরেন : ভাবছি কেন। যে কেলেঙ্কারিটা হয়ে গেল সেটাই বা কী কম? এই যে কাগজে পাশাপাশি আপনাদের দু-জনের ছবি...মনে রাখবেন এর জন্য যথেষ্ট ক্ষতি আপনার করতে পারি।

অনুপ : আপনি ভুল জায়গায় ভয় দেখাচ্ছেন সৌরেনবাবু, আপনার যা অভিরুচি করতে পারেন।

একথা বলে অনুপ বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

বাবা : যেয়ো না। শোনো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ বুদ্ধিমান। সুযোগ পেলে উন্নতি করতে পারবে। চাকরি করবে?

অনুপ : আমাকে জাতে তুলতে চাইছেন? এই জাতে তোলার লোভ দেখিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভালো ভালো মাথাগুলো আপনারা কিনে রেখেছেন। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

এবার অনুপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বাবা : (স্বগতোক্তি করেন) এরাই মানুষ।

সৌরেন : অ্যাঁ...আমাকে বলছেন?

লম্বা করিডোর দিয়ে অনুপকে চলে যেতে দেখা যায়। Dissolve

Fade in

রাস্তা দিয়ে অনুপ হাঁটছে। পায়ের Close up। Fade out

Fade in

ট্রামের চাকা। ট্রামে অনুপ বসে।

Voice over-এ বারবার শোনা যায় 'গোপা তার ভুল বুঝতে পেরেছে'।

Dissolve

34th Sequence

প্রগতি অফিসে অনুপ ঢোকে, সমর আরামকেদারায় বোসে।

সমর : আরে অনুপ যে। হঠাৎ। এমন উসকোখুসকো ভাব। কোত্থেকে এলে?

অনুপ : তোমার এখানে একটু আরাম করে বসা যাক, সমর। (বোসে) এক গ্লাস জল চাই ভাই।

সমর : হরি।

নেপথ্য থেকে হরি জবাব দেয় 'আজ্ঞে'।

সমর : এক গ্লাস জল। (একটু থেমে আবার বলে—) লক্ষণ তো ভালো নয় বন্ধু। ব্যাপারখানি কী, সেই সহকর্মিণীটির প্রভাব নাকি? বিওয়্যার অফ দিজ অ্যারিস্টোক্র্যাটস।

অনুপ : থামলে যে? (হরিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সমরের থেমে যাওয়ার কারণ বোঝে।) ও। (তারপর জল খায়।)

সমর : তবে শোনো। মজদুরের প্রতি কন্যার এই শখের দরদ তস্য পিতা যদিও বা সহ্য করেন, শূন্য পকেট সাহিত্যিকের ওপর দরদটা ঠিক বরদাস্ত করবেন না। তুমি আজ মুডে নেই দেখছি। কী হয়েছে বলো তো।

অনুপ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে বলে—

অনুপ : কিছু না।

সমর : হ্যাঁ, শোনো, দিন সাতেকের ছুটি নিলাম। মা-র শরীরটা ভালো নেই খবর পেয়েছি। কাল দেশে যাচ্ছি।

অনুপ : ও তুমি বাড়ি যাচ্ছ। ভালোই হল। মাকে আর সুমিতাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই। কোনো অসুবিধা হবে না তো।

সমর : না, অসুবিধে কী। হঠাৎ এখন ওদের দেশে পাঠাচ্ছ?

অনুপ : দেশে যাবে তা হঠাৎ কী?

35th Sequence

বারান্দায় বসে মা মালা জপ করছেন। সুমিতা কিছু বাসন নিয়ে কলতলা থেকে রান্নাঘরে ঢোকে।

মা : হ্যাঁরে, অনুপ এখনো এল না?

সুমিতা : না মা, সেই সকালে বেরিয়েছে, কী যে করে, কোথায় যে যায়, কিছুই বুঝি না।

এইসময় দরজায় টোকা পড়ে। মা বলেন—

মা : দ্যাখ্ তো, ওই বুঝি এল।

সুমিতা দরজা খুলতে যায়।

সুমিতা : (অনুপকে দেখে) ওকি, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন দাদা? শরীর খারাপ হয়নি তো?

অনুপ : হ্যাঁ, এমনি একটু ক্লান্ত বোধ করছি।

সুমিতা : তা হবে না, সেই কখন বেরিয়েছ, এই ফিরলে। মা তো তোমার জন্য ভেবে ভেবেই অস্থির। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি? তুমি বোসো। এক্ষুনি চা করে আনছি।

অনুপ : চা এখন থাক। তুই বোস সুমিতা, কথা আছে। (সুমিতা বসলে অনুপ জিজ্ঞাসা করে—) মা কোথায় রে?

সুমিতা : আহ্নিক করছেন।

অনুপ : দ্যাখ্, সমর কাল দেশে যাচ্ছে। তুই আর মা, ওর সঙ্গে দেশে চলে যা। মা তো কদ্দিন থেকেই দেশে যাব যাব করছেন।

সুমিতা : কিন্তু তোমাকে একলা রেখে?

অনুপ : আমিও ভাবছি ক-দিন পরে দেশে চলে যাব। এখানে আর ভালো লাগছে না।

সুমিতা : বেশ তো, আমরাও তাহলে তোমার সঙ্গেই...

অনুপ : না, না, তোরা সমরের সঙ্গেই কাল চলে যা, আমাকে আবার একটু আসানসোলের দিকে যেতে হবে। সেখানে শ্রমিকদের কি একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। আর তা ছাড়া আমি ঘুরে ফিরে কখন কীভাবে যাব, তার তো কোনো স্থিরতা নেই। তোরা চলেই যা।

36th Sequence

বিভাস লাইব্রেরিতে ঢুকে দ্যাখে গোপার বাবা বসে আছেন। বই পড়ছেন। বিভাস এসে একটু ইতস্তত করার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন—

গোপার বাবা : কিছু বলবে?

বিভাস : আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি অনুমতি করেন, মানে, ইফ ইউ পারমিট মি, তো একটা কথা বলি।

গোপার বাবা : বলো।

বিভাস : আমার বোন রিনিকে নিয়ে আমি কিছুদিনের জন্য রাঁচি বেড়াতে যাচ্ছি। জানেন তো সেখানে উই হ্যাভ জাস্ট পারচেজড এ নিউ হাউস, মানে একটা নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে।

গোপার বাবা : হুঁ। এ সময়ে ওখানকার জল-হাওয়া বেশ ভালো। তোমার বাবাও যাচ্ছেন নাকি ?

বিভাস : আজ্ঞে না, মানে...(বিব্রত হয়ে) বলছিলাম কি, মানে যে, আপনার অনুমতি পেলেই মিস ব্যানার্জী আমাদের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে আসতে পারেন। গুড থিং ইট উইল বি। তার মনের অবস্থা যে রকম খারাপ, কিছুদিনের জন্য বাইরের থেকে ঘুরে এলে... আপনার পারমিশান পেলেই আমি সব বন্দোবস্ত করতে পারি।

গোপার বাবা : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) তার প্রয়োজন মনে করলে তোমাকে জানাব।

37th Sequence

অনুপের বাড়ি। অনুপের ঘরের ভিতর ক্যামেরা pan করে। দেওয়ালের ছবিগুলি ঘষে মোছার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘরে খালি আসবাবপত্র পড়ে আছে। বাকি কোনো জিনিস আর নেই। বোঝা যাচ্ছে যে সুমিতা আর তার মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। শুধু অনুপ রয়েছে। Background-এ একটা বিলিতি সুর বাজে। (এই Tune-টা অন্য সব Background music-এর থেকে আলাদা। মিউজিকের প্রধান অংশে ব্যবহৃত হয়েছে Electric guitar.)

অনুপ একটা দলা পাকানো কাগজ নিয়ে জানলার কাছে যায় ও মাথা উঁচু করে 'উদয়ের পথে' লেখাটি মোছার চেষ্টা করে। এইসময় মাথা তুলে দেখে উলটোদিকের বাড়িতে একটি তরুণী রেডিয়োর কাছে। Background music আসলে প্রতিবেশীর বাড়ির রেডিয়োতে বাজছে। অনুপ জানলা বন্ধ করে দেয়। আবার ঘরের মধ্যে এসে মাটিতে পড়ে থাকা খবরের কাগজের দিকে তার দৃষ্টি যায়। সেই হেড লাইন। অবশ্য এবার একটা ইংরেজি কাগজে। এখানেও গোপা ও অনুপের ছবি পাশাপাশি। আমরা দেখতে পাই হেডলাইনের খবর : 'Millionaire's daughter sides with millworkers' cause'। অনুপ খবরের কাগজটা নিয়ে গোপার ও নিজের ছবির মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে ফ্যালে। ছেঁড়া কাগজের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় যে দরজায় গোপা এসে দাঁড়িয়েছে।

গোপা : (হাসিমুখে) কেমন আছেন?

অনুপ : ভালোই।

গোপা ঘাড় ফিরিয়ে ঘরটাকে দ্যাখে। মাটিতে পড়ে থাকা ছেঁড়া কাগজও লক্ষ করে কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করে না। কিন্তু বোঝে কিছু একটা হয়েছে।

গোপা : সুমিতা কোথায়?

অনুপ : সুমিতা, মা, দু-জনেই কাল চলে গেছে দেশে।

গোপা : দেশে?

অনুপ : হ্যাঁ, আমিও আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে দেখা হয়ে ভালোই হল। অভিনন্দনটা জানিয়ে যাবার সুযোগ জুটল।

গোপা : অভিনন্দন। কেন?

অনুপ : আমার মতো একজন মন্দ লোকের পাল্লায় পড়ে যতসব বাজে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে। শুনলাম আপনি সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। অনুতাপ করার প্রয়োজন তো আপনাদের জীবনে বড়ো একটা হয় না। একটা হল মন্দ কী? শুনে সেইজন্যই না হয় একটা ধন্যবাদ জানান।

গোপার মুখ ম্লান হয়ে যায়। স্থির চোখে অনুপের দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শোনে। শুধু Close up-এ দেখা যায় সে শক্ত করে টেবিলটা আঁকড়ে ধরেছে।

অনুপ : (বলে যায়) অবশ্য ভুল হয়েছিল আমারই। এ তো জানা কথা। আপনারা যে জগতের মানুষ সেখানে বসে মানুষকে দয়া করা যেতে পারে। সত্যিকারের ভালোবাসা সম্ভব নয়। (এবার অনুপের গলা একটু ভারী হয়।) শুধু আমার একটা কথা মনে করবেন গোপা দেবী, ভুল করে আপনি যে পথে পা বাড়িয়েছিলেন মানুষের জন্যে সেটাই সত্যিকারের পথ। একে ভুল করার মতো ভুল কখনো করবেন না। এখন আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে সেই প্রথমদিন আপনাকে এই ঘর থেকে যেমন করে বিদায় করেছিলাম আজো যদি সেইভাবে বিদায় করতে পারতাম।

গোপা : তাই করুন। আপনার এসব কোনো কথার জবাব আমি দেবো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখবেন আপনি যা শুনেছেন যা বুঝেছেন, সব ভুল, মিথ্যে।

অনুপ : ভুল, মিথ্যে।

গোপা : (উদগ্রীব স্বরে একটু ঝুঁকে পড়ে) হ্যাঁ, ভুল, সব মিথ্যে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার কাজে আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

অনুপ : আর একটু ভেবে বলো গোপা। অত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে নেই। ভুল হতে পারে।

গোপা : এতে আর ভাববার কিছু নেই। কিন্তু আর তো আমার থাকার উপায় নেই। কাল বিকেল পাঁচটায় আমি আসব। আমার অনেক কথা তোমাকে বলবার আছে। সেসব না শুনে তুমি যেতে পারবে না। এই আমার অনুরোধ।

38th Sequence

গোপা লাইব্রেরিতে ঢোকে। গোপার বাবা ড্রেসিং গাউন পরে পায়চারি করছিলেন। গোপাকে দেখে বলেন—

বাবা : কোথায় গিয়েছিলে? বলো? বলো কোথায় গিয়েছিলে?

গোপা : অনুপবাবুর বাড়ি।

বাবা : আমার কথা অমান্য করার সাহস তোমার কী করে হল?

গোপা : কিন্তু আমি তো...

বাবা : যাও, ওপরে যাও। সৌরেনকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।

Dissolve

Fade in

গোপার বাবা পায়চারি করছেন।

সৌরেন : (ঘরে ঢুকে বলে—) আমাকে আপনি ডেকেছিলেন?

বাবা : দ্যাখো সৌরেন, আমি স্থির করেছি আমি কিছুদিনের জন্য গোপাকে নিয়ে একটু বাইরে যাব।

সৌরেন : আমারও মনে হয় তাই ভালো।

বাবা : তুমি আজই একবার আনন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। রায়বাহাদুর আনন্দ চৌধুরী আমার বন্ধু। চিনলে তো।

সৌরেন : আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা : তার ছেলেটি ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে এসেছে। সম্বন্ধের প্রস্তাব করে তিনি কিছুদিন আগেই আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। আমার হয়ে কথাটা তুমি তার কাছে উত্থাপন করবে। সম্ভব হলে ছেলেটি যেন কালই একবার গোপার সঙ্গে আলাপ করে যায়। Dissolve

39th Sequence

অনুপের বাড়িতে। অনুপ দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকায়। পৌনে পাঁচটা বাজে।

(Cut to)

সৌরেনের বাড়িতে একটা ঘড়ি, বাজছে। একটা জানলার পাশে ছোটো টি-টেবিলে বসে গোপা ও তার বাবা চা খাচ্ছেন।

বাবা : আর এক পেয়ালা চা ঢালো তো গোপা।

গোপা : বেশি চা খেলে যে তোমার আবার রাত্রে ঘুম হয় না বাবা।

বাবা : তা হোক, তুমি দাও।

গোপা আর এক কাপ চা ঢেলে দিলে তিনি বলেন—

বাবা : আর লাইব্রেরি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' বইখানা নিয়ে এসো তো। বসে একটু পড়ো, শুনি।

গোপা : এখন আমার একটু কাজ আছে।

বাবা : কাজ, কী এমন কাজ?

গোপা : আমাকে একবার বেরোতে হবে বাবা।

বাবা : বেরোতে আমি তোমাকে বারণ করেছি, একথা ভোলোনি নিশ্চয়ই।

গোপা : আমি। আমি যে একজনকে কথা দিয়েছি বাবা।

বাবা : কাকে? বলো...হুঁ...না...তোমার যাওয়া হবে না। Dissolve

Fade in

অনুপ বই পড়তে পড়তে অপেক্ষারত।

অনুপের ঘরের দেয়ালঘড়িতে পাঁচটা বাজল, দরজায় টোকা পড়ে।

অনুপ : (হেসে বলে) এসো।

কিন্তু দরজা খুলে ঢোকেন গোপার বাবা।

গোপার বাবা : আমাকে দেখে অবাক হয়েছ নিশ্চয়।

অনুপ : অবাক...তবে অপ্রত্যাশিত তো বটেই। বসুন।

গোপার বাবা বসেন না। অনুপ আবার তার গদিবিহীন খাটে বসে পড়ে।

গোপার বাবা : তোমাকে একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি।

অনুপ : বলুন।

গোপার বাবা : গোপার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তারপরে আর তোমাদের মেলামেশা আমার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আশা করি এটা তুমিও স্বীকার করবে। (একটু থেমে) তুমি হয়তো ভাবছ যে একথা নিজের মেয়েকে না বলে তোমাকে বলতে এসেছি কেন? (আরো একটু থেমে) অবশ্য জোর করে আমি গোপাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কী জানো? ওইখানটায় আমি বড়ো দুর্বল। ওর ওপর কোনো রূঢ় ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। (মুখ তুলে ওপর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে চলেন—) গোপা যখন ছ-মাসের শিশু তখন ওর মা স্বর্গে গেলেন। (এবার গলার স্বর পরিবর্তন করে অনুপের দিকে ফিরে—) যাক, ওসব কথা অবান্তর। ওকে দুঃখ দিতে পারিনে বলেই তোমার কাছে আমি এলাম। এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো।

অনুপ : আমি কী করতে পারি বলুন।

গোপার বাবা : তুমি তো জানো, গোপা আজন্ম ঐশ্বর্য বিলাসের মধ্যে মানুষ। সে কি কখনো সাধারণ জীবনের দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে নেমে এসে সুখী হতে পারবে? আজ হয়তো একটা সাময়িক খেয়ালের বসে এই জীবনকেই সে মনে করছে স্বর্গ। এ মোহ তার একদিন ভাঙবে। কিন্তু তখন তার আর ফিরে যাবার পথ থাকবে না। তাই আমি আজ তার মঙ্গলের কথা ভেবে চিন্তিত। আশা করি তুমিও তার অমঙ্গল কামনা করো না। গোপা আমার একমাত্র মেয়ে। তাকে আমি স্বাভাবিক জীবনে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমার এই শান্তির পথে বাধা হয়ো না। (Background-এ বেহালা বেজে ওঠে।)

অনুপ গোপার বাবার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুনছে। গোপার বাবা বলে চলেছেন—

গোপার বাবা : (কোমল কণ্ঠে) তুমি নিজেকে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, এই আমার অনুরোধ। এই অনুগ্রহটুকুই তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে এসেছি।

অনুপ : (চোখ বন্ধ করে) বেশ আমি স্বেচ্ছায় আপনার শান্তির পথে বাধা হব না। আমার কর্তব্য স্থির করে কাল আমি আপনাকে জানাব।

গোপার বাবা : তোমার নিজের সুখ-শান্তির কামনা করা আমার নিরর্থক। আমার আন্তরিক কামনা, তোমার হাত দিয়ে মানুষের মঙ্গল হোক।

বাবা বেরিয়ে যান। অনুপ স্থির দাঁড়িয়ে।

Dissolve

40th Sequence

গোপা একটা জানলায় হেলান দিয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সাধারণ শাদা শাড়ি।

সৌরেন : একী, তুই এখনো এইভাবে দাঁড়িয়ে? আমাদের অপদস্থ করাই বুঝি তোর উদ্দেশ্য?...বাবা অনুরোধ করেছেন বলেই উনি এসেছেন। অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও না হয় একবার আলাপ করে যা।

গোপা : যাচ্ছি, চলো।

সৌরেন : এই পোশাকেই?

গোপা : হ্যাঁ, চলো।

সৌরেন : বেশ, চলো। যেমন তোমার ইচ্ছে।

নীচে বসবার ঘরে একটা বড়ো পেইন্টিং-এর নীচে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হোল্ডারে লাগানো সিগারেট খাচ্ছেন ও ছবিটি দেখছেন। সৌরেন ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে বলে—

সৌরেন : ভেরি স্যরি। আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। জানেন তো মেয়েদের ব্যাপার।

ভদ্রলোক : দ্যাটস অল রাইট।

সৌরেন : আসুন। পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বোন গোপা। মি. দেবনারায়ণ চৌধুরী। বার-অ্যাট-ল।

দেবনারায়ণ : প্লিজড টু মিট ইউ।

বলে হ্যান্ডশেক করতে যায়। কিন্তু গোপা তার উদ্যত হাত গ্রহণ করে না। অপ্রতিভ দেবনারায়ণ চৌধুরী হেঁ হেঁ করে হাসে।

সৌরেন : আসুন আসুন, বসা যাক।

দু-জনে গিয়ে একটা সোফায় বসে, গোপা অন্য সোফাতে। একটু নীরবতার পর দেবনারায়ণ বলে—

দেবনারায়ণ : আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কী বলেন?

গোপা : হুঁ।

আবার একটু চুপচাপ। দেবনারায়ণ আবার বলে—

দেবনারায়ণ : সেদিন কাগজে আপনার ছবি দেখছিলাম।

বলেই বোঝে যে বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। সামলে নেয়।

দেবনারায়ণ : শুনেছি আপনি খুব ভালো গাইতে পারেন।

গোপা : হ্যাঁ, শুনবেন একটা গান?

দেবনারায়ণ : বেশ তো।

দেবনারায়ণ ও সৌরেন স্বস্তিবোধ করে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সোফাতে দু-জনে পাশাপাশি বসে। একজনের মুখে হোল্ডারে লাগানো সিগারেট ও অন্যজনের মুখে পাইপ। গোপা অর্গানের সামনে গিয়ে বসে। গাইতে শুরু করে—

তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কী যে।
নতুন জালে আবার আমি জড়াই নিজে॥
আমার বুকের মালা তোমার পায়ের কাছে,
হার মেনে হায় ব্যথায় সে যে লুটায় লাজে;
ভুলে যাওয়ার সাধনখানি হয় রে মিছে॥

দেবনারায়ণ ও সৌরেন দু-জনেই গান শুনে অবাক। দু-জনেই অপ্রস্তুত হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। গোপা গেয়ে চলে—

নয়ন আমার মগন করো স্বপন-রূপে,
তোমার আগুন গন্ধে জ্বলে আমার ধূপে;
(আমি) যতই করি তোমার লাগি আমারে ক্ষয়,
হৃদয় বলে, তোমারই জয় তোমারই জয়;
চরণ চলে নয়ন যে হায় তাকায় পিছে॥

— শৈলেন রায়

গান শেষ করে গোপা অর্গানের ওপর ভেঙে পড়ে, তারপর উঠে ভিতরে চলে যায়। সৌরেন উঠে পড়ে। দেবনারায়ণকে 'এক্সকিউজ মি' বলে বেরিয়ে যায়।

(Cut to)

গোপা উপরে উঠে মায়ের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে—

গোপা : মা, আজ তুমি বেঁচে থাকলে...

ঘরে আরামকেদারায় বসে গোপার বাবা 'পূর্ব্বাচল' পড়ছেন। চেয়ারের পিঠের দিকটা ফেরানো বলে গোপা দেখতে পায় না বাবাকে। এবার সৌরেন ঢোকে। সেও দেখতে পায় না তার বাবাকে। গোপাকে বলে—

সৌরেন : তুই অভদ্রের মতো ওখান থেকে উঠে এলি যে? সব রকমেই আমাদের পরিবারের মুখ হাসালি। এসব লোককে তোর ভালো লাগবে কেন? তোর ভালো লাগবে ওই চালচুলোহীন লোকটাকে, একবার ভেবে দেখেছিস থাকবি কোথায়, খাবি কী?

গোপা : লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে থাকে, যা খায়।

সৌরেন : ওহ্, বড়ো বড়ো কথা শেখা হয়েছে। এসব বলতে শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি? পারিবারিক সম্মানজ্ঞানটা পর্যন্ত নেই। গিয়ে জুটেছিস একটা লোফারের সঙ্গে।

গোপা : (বেশ চেঁচিয়ে উঠে) লোফার। লোফার তুমি কাকে বলছ দাদা। মিথ্যে বলে যার বই এনে ছাপিয়ে সম্মান আর বাহবা লুটছ তাকে? এর পরেও তিনি তোমাকে ক্ষমা করেছিলেন। প্রতিদানে তুমি তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ গুণ্ডা। বিদ্যা, বুদ্ধি, মনুষ্যত্বে তিনি তোমার সামনে দেবতুল্য।

সৌরেন : শাট আপ। দেবতুল্য! বাবা আদর দিয়ে দিয়ে তোমাকে মাথায় তুলেছেন। আমি হলে তোকে আজ...

এবার আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাবা হাঁক দেন—

বাবা : সৌরেন্দ্রনাথ। (তারপর গোপাকে বলেন—) গোপা এদিকে এসো। তুমিও অন্যায় করেছ। ওখান থেকে উঠে আসা তোমার উচিত হয়নি।

নেপথ্যে প্রবল কোলাহল শোনা যায়। বাড়ির নীচে দরজার সামনে একদল শ্রমিক শ্রেণীর লোক হইচই করে বলছে—'দেখা করতেই হবে।' ওপরে বাবা সৌরেনকে বলেন—

বাবা : দেখে এসো তো, বাইরে এত গোলমাল কীসের।

কোলাহলের মধ্য দিয়ে সৌরেন নেমে যাচ্ছে। কিছু টুকরো টুকরো কথোপকথন শোনা যাচ্ছে। 'দেখা করতে চাই', 'দেখা হবে না'...ইত্যাদি। Dissolve

Fade in

সৌরেন ওপরের ঘরে গিয়ে বাবাকে বলে—

সৌরেন : মিল থেকে এমপ্লয়িরা সব এসেছে, গোপাকে 'নমস্কার' জানাতে। তাদের ধারণা, গোপাই সব আদায় করে দিয়েছে।

বাবা : ওরা তোমাকে সম্মান জানাতে এসেছে গোপা। ওদের সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াও।

গোপা বেরিয়ে যায়। সৌরেন ও তার বাবার কথাবার্তা চলতে থাকে।

সৌরেন : বিভাস এইমাত্র এসেছিল। এই ব্যারিস্টার ছেলেটির স্বভাবচরিত্র নাকি তেমন ভালো নয়। একটি মেয়ের সঙ্গে কী সব কেলেঙ্কারি করেছে। তার গার্জেন তো কেস করবে বলে শাসাচ্ছে।

(Cut to)

Foreground-এ শ্রমিকরা, Background-এ দেখা যায় গোপা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। গোপাকে দেখে রব ওঠে, 'গোপা দিদি কী জয়।' তারাপদ ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বলে—

তারাপদ : নমস্কার। আগামীকাল আমরা একটি সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে অভিনন্দন জানাব বলে। আপনার জন্যই আমরা...

গোপা : না। এজন্য তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল অনুপবাবুর কাছে। এ সম্মান, কৃতজ্ঞতা তাঁরই প্রাপ্য।

তারাপদ : তাঁর কাছে আজ সকালে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো আজ এ সভাতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। তিনি যে আজই চলে যাচ্ছেন এখান থেকে।

গোপা : চলে যাচ্ছে? কোথায়?

তারাপদ : তা তো জানি না। ও হ্যাঁ, এই চিঠিটা তিনি দিয়েছেন। আপনার বাবাকে দেওয়ার জন্য।

গোপা চিঠি খুলে পড়বার আগে ওদের লক্ষ করে। তারপর বলে—

গোপা : আচ্ছা তোমরা এবার যাও।

গোপা : (চিঠিটা পড়ে স্বগতোক্তি করে—) বাবার অনুরোধে, আমার ভালোর জন্যে তিনি চলে যাচ্ছেন।...না না, এ হতে পারে না।

(Cut to)

ঘরে সৌরেন তখনো বাবার সঙ্গে কথা বলছে—

সৌরেন : বিভাস বলছিল দরকার হলে সে প্রমাণও দিতে পারে।

বাবা : তাকে বলো প্রমাণের দরকার নেই। (তারপর স্বগতোক্তি) এরাই আবার সমাজের মানুষ বলে পরিচয় দেয়।

বাবা মা-র ছবির নীচে গোপা ছুটে এসে ঢোকে, বাবাকে চিঠিটা দেয়।

গোপা : আমি একবার এখুনি অনুপবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই বাবা। (বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে) আমাকে যে একবার...

বাবা : যেতেই হবে, না। যাবেই যদি স্থির করেছ তবে অনুমতি নিতে এসেছ কেন?

গোপা : আমি তাকে কথা দিয়েছি, তুমি আমাকে বারণ কোরো না বাবা।

একথা বলে ছুটে বেরিয়ে যায়। বাবা কাতরকণ্ঠে 'গোপা' বলে ডাক দেন। সৌরেন গোপার পেছনে ছোটে। গোপাকে ধরে ফেলে বলে—

সৌরেন : একী, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

গোপা : বললাম তো দাদা, আমি তাকে কথা দিয়েছি। আমাকে যেতেই হবে।

পিছনে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীর ছবি টাঙানো। গোপা সিঁড়ি দিয়ে নেমে সিঁড়ির তলায় এসে পৌঁছায়।

সৌরেন : (পিছন পিছন নেমে) তুই কী খেপে গেলি নাকি? ও এখান থেকে চলে যাচ্ছে তাতে তোর কী?

গোপা : সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, দাদা।

সৌরেন : বাবার নিষেধ অমান্য করে তুই চলে যাবি?

গোপা : বাবা তো নিষেধ করেননি।

সৌরেন : সোজাসুজি না বললে বুঝি নিষেধ করা হয় না? এভাবে চলে যাবার ফলাফলটা তুই ভেবে দেখেছিস?

গোপা : দেখেছি। (বলে আবার চলে যেতে উদ্যত হয়।)

সৌরেন : গোপা...শোন্।

গোপা : আমার আর শোনবার সময় নেই।

সৌরেন : বেশ, তবে একথা জেনে যাও এ বাড়িতে ফেরবার পথ তোমার চিরদিনের জন্য বন্ধ হল।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বাবা তাদের কথা শুনছেন।

গোপা : বাড়ি তোমার নয়। তবু তোমার কথাই মেনে নিলাম।

সৌরেন : তুমি যাবে না। তোমার খেয়ালের জন্য এত বড়ো একটা বংশের মর্যাদা নষ্ট হতে আমি দেবো না। যেতে তুমি পারবে না।

গোপা : (চিৎকার করে) দাদা।

সৌরেন : না, তুমি যাবে না।

বাবা : ওকে যেতে দাও সৌরেন।

Low angle shot। সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে গ্রাফিক ডিজাইন সৃষ্টি করেছে ও তিনজনকেই একসঙ্গে Frame-এ দেখা যাচ্ছে। Background-এ মিউজিক শোনা যায়। গোপা একা Frame-এ, খুশির হাসি হেসে বেরিয়ে যায়।

সৌরেন : কিন্তু গোপা যে নেমে গেল বাবা।

বাবা : (ক্লান্তভাবে) হ্যাঁ, নেমেই গেল।

একটা হুডখোলা গাড়িতে করে গোপা বেরিয়ে যায়।

41st Sequence

অনুপের বাড়ির দরজা। বাড়ি বন্ধ। কতগুলো পর পর Shot।

খালি ঘর। জানলা দিয়ে বিড়াল বেরিয়ে আসছে। তালাবন্ধ দরজা। গোপা 'অনুপবাবু' বলে ছুটে এসে ঢুকে বন্ধ দরজাতেই ঘা দেয়। জানলা দিয়ে উঁকি মারে। ছোটাছুটি করে। ডাকতে থাকে 'অনুপবাবু', 'অনুপবাবু'। বাড়িওয়ালা ডাক শুনে বেরিয়ে এসে বলে—

বাড়িওয়ালা : সে কী, আপনি?

গোপা : অনুপবাবু কোথায়?

বাড়িওয়ালা : তিনি তো আজ সকালেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। বদ্ধ পাগল মশাই, বদ্ধ পাগল। ট্যাকে পয়সা নেই, হেঁটেই রওনা হয়ে পড়লেন।

গোপা : কোন দিকে?

বাড়িওয়ালা : ওই আসানসোলের ওখানে কী একটা মজদুরদের গণ্ডগোল।

গোপা : আসানসোল?

বাড়িওয়ালা : হ্যাঁ, আসানসোল। তা আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি তো এতক্ষণ অনেক দূর রওয়ানা হয়ে গেছেন।

গোপার গাড়ি ছুটছে রাস্তা দিয়ে। 'চলো বীর,' গানের সুর Background-এ শোনা যায়। রাস্তায় রোড সাইন দেখে বোঝা যায় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। অনুপ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মাইলস্টোন পেরিয়ে গেল। লেখা আছে 'কলকাতা:২৮কি.মি.'। গোপা গাড়িতে। Parallel cutting চলে। Background-এ শোনা যায় আগে ব্যবহৃত 'চলো বীর' গানটির সুর। কিছুক্ষণ Parallel cutting-এর পরে গোপা অনুপকে দেখতে পায়। চেঁচায় 'রোকো'। ব্রেক কষে গাড়ি থামে। অনুপ (গাড়ি থামার শব্দ শুনে) ঘুরে দাঁড়ায়। গাড়ির দরজা খুলে গোপা ছুটে অনুপের পায়ের কাছে পড়তে গেলে অনুপ ধরে ফেলে উঠিয়ে দেয়। মিউজিক থেমে যায়।

গোপা : আমি তোমার চলার পথে বাধা দিয়ে আসিনি।

অনুপ : কিন্তু তুমি!

গোপা : আমি আজ সব ঐশ্বর্য পেছনে ফেলে তোমার মতো সেবাব্রত নিয়ে নেবে এসেছি।

অনুপ : (গোপার হাত মুঠো করে ধরে) নেমে এসেছি। সেকী...বলো উঠে এসেছি। ঐশ্বর্য তুমি পেছনে ফেলে আসোনি গোপা, ঐশ্বর্য তোমার সামনে। যাদের ডাকে আজ তুমি এগিয়ে এসেছ তাদের মধ্যেই সত্যিকারের ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবে। বলে দু-জনে ক্যামেরার দিকে পিঠ করে এগিয়ে যায়। দু-জনে হাত ধরাধরি করে এগোয়। তাদের সামনে অস্তগামী সূর্য।

Background-এ কোরাসে গানের প্রথম কয়েকটি লাইন আবার শোনা যায়—

চলো বীর, চলো বীর, চলো বীর
... ...
ধনিকের বণিকের নিষ্ঠুর বন্ধন,
ভেঙে ফ্যালো থেমে যাক মানুষের ক্রন্দন;
আকাশে উড়ুক তব সাম্য পতাকা নব,
স্বার্থের পরাজয়ে, জয় হোক শান্তির।

সমাপ্ত

Price : Rs. 50
Vol. : 27 No. : 1

BIVAV
Special Spring Issue
Jan 2006 - Mar 2006
ISSN 0970-1885

Reg. No. : 30017/76
96th Issue

অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে
প্রমথনাথ বিশী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রকাশনার
প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা পত্রিকা

প্রতীচী প্রনাবি

একটি সেতুবন্ধনের পত্রিকা

জীবিকার সন্ধানে উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বাঙালি জনসমাজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসে বাধ্য হচ্ছেন। এই বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ আজ মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁদের কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ চিকিৎসোজীবী, কেউ শ্রমজীবী। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টির অন্তরে রয়েছে একটি দীপ্ত আলোকশিখা। মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং সেই সঙ্গে নিজের ভাষায় আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ও অপরকে জানবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের আজও বর্তমান। এঁদের এবং অবশ্যই ভারতীয় বাংলাভাষাভাষীদের মিলিত প্রতীক হয়ে অসামান্য মুদ্রণসৌকর্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রতীচী।

সম্পাদক : চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী
মূল্য : ১০০ টাকা (বাংলাদেশ ও ভারত)
যোগাযোগ : জে-২১৭ সাকেত, নিউ দিল্লি - ১১০ ০১৭
দূরভাষ : ৯১-১১-২৬৮৫ ৫৯৫২
দূরবার্তা : ৯১-১১-২৬৯৬ ২৭৩৫
ই-মেল : pratichi_pnb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.pramathanathbisi.org

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম / দে'জ পাবলিশিং